বালাগঞ্জ প্রতিদিন

balaganjprotidin.com

এপ্রিল ২০২৫ইং

বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরী

পৃষ্ঠা- ০৮

বর্ষ-০১ ☼ সংখ্যা-০১

আজ পহেলা বৈশাখ শুভ নববর্ষ-১৪৩২

স্টাফ রিপোর্ট

আজ পহেলা বৈশাখ-বাংলা নববর্ষ। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যুক্ত হলো নতুন বাংলা বর্ষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। জীর্ণ পুরাতন সবকিছু ভেসে যাক, 'মুছে যাক গ্লানি' এভাবে বিদায়ী সূর্যের কাছে এ আহ্বান জানায় বাঙালি। ১ বৈশাখ আমাদের সকল সঙ্কীর্ণতা, কুপমন্ডুকতা পরিহার করে উদারনৈতিক জীবন-ব্যবস্থা গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের মনের ভিতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে আমাদের নতুন উদ্যোমে বাঁচার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা যে বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণে আমাদের মধ্যে এই স্বাজাত্যবোধ এবং বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়।

অন্যদিকে, পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্যাপিত হয় নববর্ষ।

আজ পহেলা বৈশাখে বর্ণিল উৎসবে মেতেছে বালাগঞ্জসহ সারাদেশ। এ উপলক্ষে সারাদেশ জুড়ে থাকছে বর্ষবরণের নানা আয়োজন। এবার নতুন উদ্যমে 'বাংলা নববর্ষ ১৪৩২' জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ 'আনন্দ শোভাযাত্রা' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ছায়ানট ভোরে রমনা বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।

এছাড়াও বালাগঞ্জসহ সিলেটের সবকটি উপজেলা ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ১

পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা

পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ উপলক্ষে দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের এক উজ্জল আনন্দময় উৎসব। এই উৎসব আমাদের দেশের একটি ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখ থেকেই শুরু হয় নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার আকুলতা। নতুন বছর মানেই অতীতের সকল ব্যর্থতা, জরাজীর্ণতা পেছনে ফেলে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহে সুন্দর সমৃদ্ধ আগামীর অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়া। বিচ্ছেদ ও বিভাজন দূর করে ১লা বৈশাখের উৎসবের প্রাঙ্গণ ভরে উঠুক পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসায়।

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আমাদের সকল পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের জানাই

শুভেচ্ছা

প্রাণের উৎসব

শেখ একেএম জাকারিয়া

বাংলা নববর্ষ, অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ, বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসব। এই দিনটি শুধু ক্যালেন্ডারের নতুন পাতা নয়- এটি বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির প্রাণ। বছরের প্রথম দিনটিকে ঘিরে দেশজুড়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। শহর থেকে গ্রাম- সবখানেই ধরা পড়ে বৈশাখের উচ্ছ্বাস।

পহেলা বৈশাখ মানেই সকালবেলা রমনার বটমূলে ছায়ানটের আয়োজন, চারুকলার ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ১

অবহেলিত বালাগঞ্জ

ফায়ার স্টেশন, সেতু ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দীর্ঘ অপেক্ষা

এসএম হেলাল

স্বাধীনতার পর থেকে সারাদেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা চললেও উন্নয়ন বঞ্চিত এক জনপদের নাম সিলেটের বালাগঞ্জ। এ উপজেলায় বড়ভাঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন এবং যুব সমাজকে দক্ষ করে তুলতে একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দাবি এখানকার মানুষের বহুদিনের। কিন্তু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুঁড়ির বাইরে কার্যত কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বালাগঞ্জের ছয়টি ইউনিয়নের মধ্যে পূর্ব গৌরীপুর, পশ্চিম গৌরীপুর, দেওয়ানবাজার এবং বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়নের একাংশ উপজেলা সদর থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন। বড়ভাঙ্গা নদীর ওপর সেতু না থাকায় সরাসরি যাতায়াতের পথ নেই। সিলেট শহরের সঙ্গে সংযোগ করতে হলে প্রায় দ্বিগুণ পথ পাড়ি দিতে হয় ফেঞ্চুগঞ্জ বা ওসমানীনগর হয়ে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও করুণ হয়ে ওঠে। নদী পার হতে নৌকার ওপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষার্থী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য এ যাত্রা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের দাবির পর ২০১৮ সালে "শেখ হাসিনা সেতু" নামে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও, প্রকল্পটি এখনো কাগজেই সীমাবদ্ধ।

অন্যদিকে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনায় পুরো উপজেলাবাসী চরম ঝুঁকিতে থাকে। একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন না থাকায় দুর্ঘটনা হলে পার্শ্ববর্তী ওসমানীনগর উপজেলা বা জেলা শহর থেকে দমকল কর্মীদের আসতে অনেক সময় লাগে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায় বহুগুণ।

এ ছাড়া বালাগঞ্জ প্রবাসী অধ্যুষিত একটি এলাকা। কিন্তু দক্ষতার অভাবে এখানকার যুবসমাজ বিদেশে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারছে ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ১

'ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগানে প্রকম্পিত ঢাকা

ইসরায়েলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের প্রতি আহ্বান

নিউজ ডেস্ক

ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যার প্রতিবাদে লাখো জনতার ঢল নেমেছে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। মার্চ ফর গাজা নামের এই কর্মসূচিতে আসা সবার কণ্ঠে 'ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগানে শনিবার সকাল থেকে প্রকম্পিত রাজধানী ঢাকা। সবার মুখে গণহত্যা বন্ধ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। অনেকের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে 'ফিলিস্তিন মুক্ত করো; গাজা রক্তে রঞ্জিত, বিশ্ব কেন নীরব'– এমন লেখা দেখা গেছে।

শনিবার বেলা তিনটার কিছু পরে এই গণজমায়েত শুরু হয়। গণজমায়েতে বিপুল মানুষের উপস্থিতি দেখা গেছে। সেখানে 'ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগান দেন উপস্থিত জনতা। মঞ্চে এই কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বিভিন্ন দলের নেতাদের উপস্থিত হতে দেখা গেছে।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে যখন বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে, তখন বাংলাদেশেও 'প্যালেস্টাইন সলিডারিটি মুভমেন্ট বাংলাদেশ'-এর ব্যানারে আয়োজিত হচ্ছে 'মার্চ ফর গাজা' নামক একটি ব্যতিক্রমধর্মী গণসমাবেশ।

বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), হেফাজতে ইসলাম, বাংলাদেশ হেলাফত মজলিসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিভিন্ন সংগঠন, ইসলামি বক্তা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ইতোমধ্যে 'মার্চ ফর গাজা' শীর্ষক এই কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

সকাল থেকেই 'মার্চ ফর গাজা' গণজমায়েত কর্মসূচিতে যোগ দিতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল মানুষ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যেতে শুরু করেন। শাহবাগ ও আশপাশে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

দুপুরে মিরপুর, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, বাংলামোটর ও শাহবাগ এলাকা হয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যেতে দেখা গেছে। পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলে করে তরুণদের স্লোগান দিতে দিকে উদ্যানের দিকে যেতে দেখা গেছে।

দলমত নির্বিশেষে নানা বয়সি মানুষ এ কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। শুধু ফিলিস্তিনের মানুষের প্রতি সংহতি জানানো নয়, বরং মানবতার পক্ষেও এই অবস্থান বলে জানান অনেক অংশগ্রহণকারী। তারা জানান, ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ওপর যেভাবে গণহত্যা চালানো হচ্ছে, তা সহ্য করা যায় না। তাই প্রতিবাদ জানাতে আজ এখানে এসেছি।

আয়োজক সূত্রে জানা যায়, গাজায় চলমান বর্বরোচিত ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন এবং মানবিক সহানুভূতি জাগ্রত করতেই অনুষ্ঠিত হলো ব্যতিক্রমধর্মী এই গণজমায়েত। বেলা ৩টা থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই 'মার্চ ফর গাজা' কর্মসূচি চলে।

প্যালেস্টাইন সলিডারিটি মুভমেন্ট বাংলাদেশের আয়োজনে মার্চ ফর গাজা কর্মসূচিতে ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। শনিবার (১২ এপ্রিল) রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত কর্মসূচির মূল মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ফিলিস্তিনের সমর্থনে এ ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

ঘোষণাপত্রে ইসরায়েলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া গাজায় ইসরায়েলি ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ২

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ

৫ বাংলাদেশিসহ ৪ শতাধিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র

নিউজ ডেস্ক

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অপরাধে পাঁচ বাংলাদেশিসহ চার শতাধিক বিদেশি শিক্ষার্থীর 'স্টুডেন্ট ভিসা' বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শিক্ষার্থীরা ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছিল। এসব শিক্ষার্থী গত ২ বছর ফিলিস্তিনে ইসরায়েলিদের বর্বর হামলা ও হত্যাযজ্ঞবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) মার্ক রুবিও এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, ভিসা বাতিলকৃত বিদেশি শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ফিলিস্তিনের পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের চিহ্নিত করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবার পরও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ করার অপরাধে চাকরি পাবার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

গত ৭ দিনে চার শতাধিক বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল হওয়াদের মধ্যে মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি পাঁচ জন শিক্ষার্থী। তাদের ২ জনের বাড়ি সিলেট জেলায়, ২ জন ঢাকা ও ১ জন বগুড়া জেলার। এ তথ্য ছড়িয়ে পড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ফিলিস্তিনে ইসরাইলের গণহত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত মিছিলে শতশত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ২

ইহুদিবিরোধী পোস্ট দিলেই ভিসা, গ্রিনকার্ড আবেদন বাতিল

নিউজ ডেস্ক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইহুদিবিরোধী বিবেচিত বিষয়বস্তু পোস্টকারী ব্যক্তিদের ভিসা বা বসবাসের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে। ইহুদিবিরোধী হিসেবে সংজ্ঞায়িত পোস্টগুলোতে হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের মতো যেসব গোষ্ঠীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে তাদের সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ট্রাম্প প্রশাসন বিতর্কিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল করার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। অথচ মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ২

ভারত ও নেপালে ভারী বর্ষণে প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু

নিউজ ডেস্ক

ভারত ও নেপালের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১০০ জন। বুধবার (৯ এপ্রিল) থেকে শুরু হওয়া এ দুর্যোগে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বহু প্রাণহানির ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা ও গণমাধ্যম। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতে সেখানে অন্তত ৬৪ জন নিহত হয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সেখানে ২০ জনেরও বেশি মানুষ বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর (আইএমডি) পশ্চিমাঞ্চলে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে বজ্রঝড় ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে শনিবার (১২ এপ্রিল) পর্যন্ত একটি সতর্কতা জারি করেছে। প্রতিবেশী দেশ নেপালেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। দেশটির জাতীয় ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ২

১০০০ সেনাকে বরখাস্ত করলো ইসরায়েল

নিউজ ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া প্রায় এক হাজার রিজার্ভ সেনাকে বরখাস্ত করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়াল জামির তাদের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরায়েল বিমানবাহিনীর (আইএএফ) শত শত রিজার্ভ সদস্য গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য একটি খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। চিঠিতে তারা গাজায় চলমান যুদ্ধকে 'নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত' বলে উল্লেখ করেন।

তারা আরও লেখেন, যুদ্ধ চালিয়ে বন্দিদের মুক্ত করা সম্ভব নয়, বরং যুদ্ধবিরতির মাধ্যমেই কেবল এর সমাধান হতে পারে।

চিঠি দেওয়ার বিষয়টিকে ইসরায়েলি সেনাপ্রধান জেনারেল জামির 'গুরুতর অপরাধ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে, যারা এই ধরনের বিবৃতি দিয়েছে, তারা সেনাবাহিনীতে ফিরে আসার যোগ্য নয়।

অন্যদিকে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজও সেনাদের স্বাক্ষরিত এই চিঠির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এটি যুদ্ধের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ ▶ এরপর পৃষ্ঠা-২, কলাম ২

ফায়ার স্টেশন

(১ম পাতার পর)

না। স্থানীয়ভাবে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ না থাকায় এখানকার তরুণরা পিছিয়ে পড়ছে। একটি আধুনিক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আলাপকালে উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি এই সমস্যাগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমদ সুহেল বলেন, "বর্ষায় শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অসুস্থ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে জীবন বাজি রেখে নদী পার হতে হয়। এটি একটি চরম মানবিক সংকট।

দেওয়ানবাজার ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল আলম বলেন, আমরা স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, এমনকি প্রশাসনিক সেবার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছি। বড়ভাঙ্গা নদীতে সেতু নির্মাণ এখন সময়ের দাবি।

উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. আব্দুল জলিল বলেন, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়া উন্নত বালাগঞ্জ কল্পনা করা অসম্ভব'।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম রব্বানী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার আমাদের পিছিয়ে পড়া বালাগঞ্জবাসীর ন্যায্য দাবি-বড়ভাগা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ, একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। এই প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগুলো বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। আমরা এর দ্রুত বাস্তবায়ন চাই।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজিত কুমার চন্দ বলেছেন, বড়ভাঙ্গা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ, একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন এবং একটি মানসম্মত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। এসব বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যা কিছু করণীয়, তা বাস্তবায়নে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব।

এ দিকে সচেতন নাগরিকদের অভিমত বালাগঞ্জের মানুষ যুগের পর যুগ ধরে অবহেলা সহ্য করে আসছেন। বড়ভাঙ্গা নদীতে সেতু নির্মাণ, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য আর বিলাসী দাবি নয়-এটি মৌলিক অধিকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের আন্তরিক দৃষ্টি এ বিষয়ে প্রয়োজন। এ অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের মূলধারায় ফিরবে, এটাই সবার কাম্য।

প্রাণের উৎসব

(১ম পাতার পর)

রঙিন শোভাযাত্রা, পান্তা-ইলিশ, হালখাতা আর বৈশাখী মেলা। চারুকলার ছাত্রছাত্রীরা রং-তুলিতে তৈরি করে নানা মুখোশ ও লোকজ শিল্প। ইউনেস্কো স্বীকৃত মঙ্গল শোভাযাত্রা আজ আমাদের সংস্কৃতির গর্ব হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

শহরের মতো বাংলার প্রতিটি গ্রামেও বৈশাখের প্রথম দিনে উদযাপিত হয় উৎসব। বিভিন্ন গ্রামে বসে বৈশাখী মেলা-যেখানে মাটির পুতুল, বাঁশের সামগ্রী, কাঠের খেলনা, দেশী কাপড় আর খাবারের বাহার থাকে চোখজুড়ানো। এসব মেলা শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং গ্রামীণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন সুযোগ।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়- সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই হয় বৈশাখী আয়োজন। শিক্ষার্থীরা বাহারি রঙের পোশাক পড়ে অংশগ্রহণ করে ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসবে, দেয়াল পত্রিকা, কবিতা আবৃত্তি, নাচ-গানসহ নানা অনুষ্ঠানে। এতে নতুন প্রজন্ম দেশীয় সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত হয়।

পহেলা বৈশাখ শুধু আনন্দের দিন নয়- এটি আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ঐক্য এবং সৌহার্দ্যের প্রতীক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে নববর্ষকে বরণ করে। এই দিনে দেখা যায় সম্প্রীতির এক অনন্য চিত্র, যা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করে। তবে উৎসব উদযাপন যেন হয় শালীনতা ও সচেতনতায় পরিপূর্ণ। অতি উৎসাহে অপসংস্কৃতি, শব্দদূষণ বা পরিবেশের ক্ষতি যেন না হয়। বরং পরিবেশবান্ধব, সৃজনশীল ও সমাজবান্ধব আয়োজনের মধ্য দিয়েই হোক আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়।

নতুন বছরের এই শুরু আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পুরানো দুঃখ পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। বৈশাখ আমাদের শেখায় সাহস নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখার কথা। এই উৎসব হোক আনন্দ, ঐক্য আর সচেতনতায় ভরপুর একটি সুন্দর যাত্রার শুরু।

মল্লিকপুর, সুনামগঞ্জ

আজ পহেলা বৈশাখ

(১ম পাতার পর)

প্রশাসন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন করবে। বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান আবশ্যিকভাবে জাতীয় সংগীত ও এসো হে বৈশাখ গান পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হবে।

এক সময় নববর্ষ পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির, কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর। পরে কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলা সন গণনার শুরু হয়। হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌর সনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় নতুন এই বাংলা সন। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁদের পুরনো হিসেব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসেবের নতুন খাতা খুলতেন।

এ উপলক্ষে তাঁরা নতুন-পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরাচরিত এ অনুষ্ঠানটি আজও পালিত হয়।

মূলত ১৫৫৬ সালে কার্যকর হওয়া বাংলা সন প্রথমদিকে পরিচিত ছিল ফসলি সন নামে। পরে তা পরিচিত হয় বঙ্গাব্দ নামে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে বাংলাবর্ষের ইতিহাস জড়িয়ে থাকলেও এর সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসেরও সংযোগ ঘটেছে। পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের।

আর ষাটের দশকের শেষে তা বিশেষ মাত্রা পায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনের মাধ্যমে। এসময় ঢাকায় নাগরিক পর্যায়ে ছায়ানটের উদ্যোগে সীমিত আকারে বর্ষবরণ শুরু হয়। আমাদের মহান স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব নাগরিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ধারক-বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, উৎসবের পাশাপাশি স্বৈরাচার-অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এসেছে পহেলা বৈশাখের আয়োজনে।

ইহুদিবিরোধী পোস্ট

(১ম পাতার পর)

বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়।

স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা মন্ত্রী ক্রিস্টি নয়েম 'স্পষ্ট করে বলেছেন যে যারা মনে করেন তারা আমেরিকায় এসে ইহুদিবিরোধী সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের পক্ষে প্রথম সংশোধনীর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারেন - তারা আবার ভাবুন। এখানে আপনাকে স্বাগত জানানো হবে না।"

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন বিষয়বস্তু বিবেচনা করবে যা ইঙ্গিত দেয় যে, কোনো বিদেশী ইহুদিবিরোধী সন্ত্রাসবাদ, ইহুদিবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন বা অন্যান্য ইহুদিবিরোধী কার্যকলাপকে সমর্থন করছেন, সমর্থন করছে, প্রচার করছে" মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা সুবিধা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক কারণ হবে।"

এই নীতি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং শিক্ষার্থী ভিসা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার জন্য স্থায়ী বাসিন্দা 'গ্রিন কার্ড' এর আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫ বাংলাদেশিসহ ৪

(১ম পাতার পর)

অংশ নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০ হাজার বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে লেখাপড়া করছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর দৃষ্টি আর্কষণ করলে তিনি প্রতিবেদককে বলেন, আমি নির্দিষ্টভাবে একজন ছাত্রের কথা শুনেছি। তার স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল হয়েছে। তাকে আইনগত সহায়তাও দিচ্ছি। ভিসা বাতিলের বিরুদ্ধে ছাত্রটি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। প্রাইভেসির কথা বিবেচনা করে তার নাম ও পরিচিতি দিতে পারব না। তবে সময়টি ভালো যাচ্ছে না। বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী যারা এখানে লেখাপড়া করছেন তাদের সর্তকতার সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে। কোনো ধরনের আইন ভঙ্গ করা যাবে না। ক্রাইমে লিপ্ত হওয়া যাবে না। স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ যেন শেষ না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সময় মতো নবায়ন করতে হবে।

গেল সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্র ও ২ জন সদ্য গ্রাজুয়েটের ভিসা বাতিল করেছে। তাদের গ্রেফতার করে ডিপোর্টেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির ৪ জনের ভিসা গত শনিবার বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে সরকার বিষয়টি আমাদের নজরেই আনেনি। একইভাবে ইউনিভার্সিটি অব অ্যাক্রন এর ২ জন ছাত্রের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। গেল সপ্তাহে ডিপার্টমেন্ট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মিনেসোটার স্টেট ইউনিভার্সিটির ৫ জন শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে। তাদের আগামী ৬০ দিনের মধ্যে সেল্ফ ডিপোর্ট হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে। অনেককে গ্রেফতার করে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলো গণহারে বিদেশি ছাত্রদের ভিসা বাতিল করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছেন, ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল করার অপরাধে এ ধরনের পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থি।

১০০০ সেনাকে

(১ম পাতার পর)

করার একটি প্রচেষ্টা।

ইসরায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে, চিঠিতে স্বাক্ষরকারী উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) ড্যান হালুৎস, সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) নিমরড শেফার এবং সাবেক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্নেল (অব.) নেরি ইয়ারকোনির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

চিঠিতে তারা যুদ্ধ বন্ধ করে বন্দিদের ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে সব ইসরায়েলি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরাইলি সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ এখনও সক্রিয় রিজার্ভ ডিউটিতে রয়েছেন, বাকিরা সাবেক বা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য।

ভারত ও নেপালে

(১ম পাতার পর)

দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে বজ্রপাত ও ভারী বৃষ্টির কারণে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে বর্ষা মৌসুম সাধারণত জুনে শুরু হয়। তবে এ বছর অস্বাভাবিক আবহাওয়ার কারণে গ্রীষ্মের শুরুতেই ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড় দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ গত সপ্তাহে জানিয়েছিল, এপ্রিল মাসজুড়ে অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি গরম পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

'ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন'

(১ম পাতার পর)

আগ্রাসন বন্ধের দাবি জানানো হয়।

আয়োজনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষ ইসরাইলের বর্বরতা রুখে দিতে বিশ্ব মুসলিমকে এক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। নির্যাতিত ফিলিস্তিনের জন্য জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে মোনাজাত হওয়ার কথা রয়েছে এই আয়োজনে।

এর আগে মার্চ ফর গাজা কর্মসূচিতে যোগ দিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা বয়সি মানুষ ছোট-বড় মিছিল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একত্রিত হয়। এ কর্মসূচিতে এক হয়েছে সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও নানান ধর্ম-বর্ণের মানুষ।

ইতিহাস সৃষ্টি করে করে শুধু ফিলিস্তিনের জন্য এক মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। এছাড়া শিল্পী, কবি, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জনপ্রিয় মুখও যোগ দিয়েছেন কর্মসূচিতে। দলমত নির্বিশেষে এক কাতারে সবাই যোগ দিয়ে ইসরাইলের গণহত্যা বন্ধে সাহসী উচ্চারণ করছেন।

একই সঙ্গে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুসহ এর পেছনের কুশীলবদের বিচারের আওতায় আনতে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানান সমাবেশে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

বিশেষ নিবন্ধ

কাজল রশীদ শাহীন

পহেলা বৈশাখ : বাঙালির সর্বজনীন উৎসব

নতুন বছরের প্রথম দিন এবং বিদায়ী বছরের শেষদিনকে ঘিরে নানা ধরণের আয়োজন ছুঁয়ে যায় সকল বাঙালিকেই। বিশেষত পহেলা বৈশাখের আয়োজন বাঙালির সর্বস্তরের জনজীবনকে রাঙায়িত করে নানানভাবে। বাঙালির ঘরে, জনজীবনে এবং আর্থ সামাজিক সংস্কৃতিতে এরকম উৎসব দ্বিতীয়টি নেই। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের যেমন এই উৎসবের সঙ্গে থাকে গভীর যোগসূত্রতা, তেমনই সকল সম্প্রদায়ের, জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরাও শামিল হন এখানে।

পহেলা বৈশাখের যে উৎসব তার আতুঁড়ঘর, সৃষ্টির ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদে। নববর্ষ অর্থাৎ নতুন বছর, একেবারে নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় নতুন বঙ্গাব্দর জন্ম মোগল বাদশাহ আকবরের দরবারে। আকবরই এই সনের প্রবর্তক।

বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ আছে, 'কৃষিকাজের সুবিধার্থেই মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন এবং তা কার্যকর হয় তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে (৫ নভেম্বর ১৫৫৬)।' প্রধানত কৃষকদের খাজনাপাতি দেয়ার সুবিধার্থে এই সনের প্রবর্তন করা হয়। এ কারণে এই সনের আরেক নাম 'ফসলি সন'। প্রথমে এটিই প্রচলিত ছিল, পরে এর পরিচিতি দাঁড়ায় বঙ্গাব্দ নামে, যা আজও কার্যকর রয়েছে।

চন্দ্রের নিয়মে প্রচলিত হিজরী সন ও সৌর নিয়মে প্রচলিত বাংলা সনের সঙ্গে সমন্বয় করে স্থানীয় মানুষের সুযোগ ও সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সনের প্রবর্তন করা হয়। এর আগে এই অঞ্চলের মানুষেরা ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকলেও বঙ্গাব্দ সন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে বৈশাখের প্রথম দিনের উৎসব তাদের জীবনের অন্যতম আনন্দঘন দিনে পরিণত হয়।

বৈশাখের এই উৎসবকে সর্বজনীন উৎসব বলা হয় এই কারণে যে এই উৎসবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে। বাঙালি জীবনের মৌলচেতনা হল অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করা। সেই চেতনা এখানে হাজার বছর ধরে প্রবহমান। এই সমাজের গড়নই হল এমন যে, এখানে সবাই যার যার মতো করে জীবনকে যাপন করতে পারে এবং নিজস্ব রীতিনীতি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মানুযায়ী আচার ও ধর্ম পালন করতে পারে। প্রশ্ন হল, এই সমাজের গড়ন এরকম কেন? এর কারণ হল এই সমাজ হল নদীবাহিত সমাজ।

এই দেশ হল নদীমাতৃক দেশ। নদীমাতৃক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল, তার স্থিতি, গড়ন ও বিকাশের মধ্যে স্বাতন্ত্রিকতা বিদ্যমান থাকবে। বাঙালির বা পূর্ববাংলার সমাজের ধরণটাই এরকম। আদি থেকে সে আলাদা ও সম্পূর্ণ নিজস্ব সত্তায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। একারণে এখানকার সমাজের সঙ্গে আমরা যদি উত্তর ভারতের সমাজের গড়ন ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে সহজেই এই পার্থক্যটা টের পাওয়া যাবে। উত্তর ভারত যতটা আর্য ও বিভাষী-বিজাতীয়দের দ্বারা প্রভাবিত পূর্বভারত মোটেই তেমনটা নয়। ফলে, পূর্বভারত তার স্বাতন্ত্রিকতা নিয়েই বিকশিত হয়েছে। তার এ স্বাতন্ত্রিকতা কেবল মানুষে নয়, এর সমাজে, এর প্রকৃতিতে, এর পরিবেশে, এর জল-মাটি-হাওয়া-নদী নালায় বিরাজিত রয়েছে। এমনকি আবহাওয়া ও জলবায়ুগত দিকেও পূর্বভারত উত্তর ভারত থেকে কেবল আলাদা নয়, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিতও।

বর্তমানের বাংলাদেশ একদা যা ছিল পূর্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ভারতের একটি প্রদেশ। এই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে একদা ছিল বঙ্গ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। এই বঙ্গের অতীত জুড়ে রয়েছে ভাঙ্গাগড়ার আরও ইতিহাস। সংক্ষেপিত সাম্প্রতিক ইতিহাস অবশ্য এরকমই। এখানে প্রধানত দুই ধর্মের মানুষের বসবাস। এর বাইরে আরও কয়েকটি ধর্ম বিশেষ করে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং নৃতাত্ত্বিক ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে। জাতিগতভাবে এরা বাঙালি হলেও ধর্মীয় দিক দিয়ে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে ধর্ম পালন করে। এখানকার রীতি ও নীতি হল, রাষ্ট্র-সমাজ সকলের, ধর্ম যার যার। এই ভূগোলের প্রধান দুই ধর্ম হল ইসলাম ও সনাতন ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রধান দুই উৎসব হল দুটি ঈদ, যা ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আযহা নামে সর্বজনে পরিচিত। অন্যদিকে, সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের রয়েছে নানানদেবদেবীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পূজা-পার্বণ। এসব উৎসবগুলো নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সীমায়িত থাকলেও এখানে চাইলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং কখনো কখনো এলাকা ও অঞ্চলভেদে অংশগ্রহণ করার রেওয়াজ জারি রয়েছে। এই যে একের উৎসবে অন্যের অংশগ্রহণ সেটাতে কোনোরকমের বাধার সৃষ্টি বা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপত্তি না ঘটলেও এই অংশগ্রহণে সকলের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি ঘটে না।

বঙ্গ অঞ্চলে এসবের বাইরে রয়েছে লোকধর্মকেন্দ্রিক কিছু উৎসব। যেসব অঞ্চলে লোকধর্মের প্রভাব বেশি সেখানে এই ধর্মের বৈশিষ্ট্যগত কারণে রয়েছে সকল ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ করার প্রবণতা। আবার পীরালী ব্রাহ্মণদের অনুসারীরা হিন্দু মুসলমানসহ অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের নিজস্ব উৎসবসমূহে সকল ধর্মের লোকজনই অংশগ্রহণ করেন।

বাউলদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এঁরা যেহেতু ধর্ম ও জাত পাতের উর্ধ্বে থেকে নিজেদের জীবন ও কর্মকে ধারণ ও প্রবহমান করতে চান, একারণে তাদের আয়োজনে-উৎসবে সকল ধর্মের মানুষেরা অংশগ্রহণ করতে পারেন, এবং করেনও।

লক্ষ্যণীয়, এসবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করলেও সেটা যেমন বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না, তেমনই বৃহত্তর সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণকেও নিশ্চিত করে না। কিন্তু পহেলা বৈশাখের উৎসবের ব্যতিক্রমীতা ও স্বাতন্ত্রিকতা হল এই উৎসব সর্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে। বর্তমানের বাংলাদেশে এবং ভারত রাষ্ট্রের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই উৎসবের সৌন্দর্য হল এর সর্বজনীন রূপ। যার তুলনা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, তাবৎ পৃথিবীর কোথাও, কোন প্রান্তে রয়েছে কি না তা আজোবধি জানা যায়নি।

বঙ্গাব্দ সনের শুরু হয় প্রধানত কৃষকের সুবিধার্থে। কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজেদের জীবনের আর্থিক রোজনামচাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন এই সনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বণিকের স্বার্থ, বিশেষ করে খুচরো ও মধ্য পর্যায়ের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হিসাবের খাতা সংরক্ষণ ও কার্যকর রাখা হতো এই সনের দিন তারিখ ও মাসের সঙ্গে মিলিয়ে। কারণ এভাবে হিসাব রাখার ফলে তাদের বছরের শেষে গিয়ে পুরো বছরের ব্যবসার দেনা পাওনার গতিপ্রকৃতির কী রূপ তা বুঝতে যেমন সুবিধা হতো, তেমনি বছর শেষে গিয়ে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে নতুন বছরের হিসাবের খাতা খুলতে সুবিধা হতো।

বাঙালি ব্যবসায়ীদের জীবনে হালখাতার প্রচলন শুরু হয় এই সনের বিদায়ী মাসের শেষের কয়েকদিন ও আগমনী বর্ষের শুরুর কয়েকটা দিনকে ঘিরে এবং এর মধ্যে মুখ্য হয়ে দেখা দেয় পহেলা বৈশাখের দিনটা, যা বৈশাখী উৎসব হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত ও বিশেষভাবে নন্দিত। হালখাতাকে ঘিরে এই যে আয়োজন ও উৎসব এটা প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও এখানে সীমিত পরিসরে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে এবং বাস্তবিকই সেই ধরণের উপস্থিতি ঘটেও থাকে।

হালখাতা যে প্রথা বা উৎসব সেটা শুরু হয়, মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারী ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। বাঙালি সমাজে ব্যবসার গোড়াপত্তনও হয় অবশ্য এদের হাত ধরে। সনাতন ধর্মের অনুসারীরা প্রায় সারা বছরই নানানধরণের উৎসবের রীতি মেনে চলেন। বার মাসে তের পার্বণের যে প্রবাদ বাক্য বাংলা ভাষায় জোরদারভাবে চালু রয়েছে তা মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারীদের পার্বন প্রথাকে কেন্দ্র করেই। এঁরাই যখন ব্যবসাকে আরও সহজ, ক্রেতাবিক্রেতা বান্ধব, এবং স্বচ্ছ ও লাভজনক করার চেষ্টার নিমিত্তে হালখাতা সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ততা ঘটাল সেখানে ঈপ্সিত লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই সেটাকে উৎসবমুখর করে তুললো। এবং হালখাতা সংস্কৃতি রীতিমতো একটা অংশগ্রহণমূলক আনন্দদায়ক উৎসবে পরিণত হল।

এই উৎসবের কেন্দ্রে অর্থনীতির যোগসূত্রতা মুখ্য হিসেবে থাকলেও এর পরিপার্শ্বকে এমনভাবে রাঙায়িত করা হল সেটা যেন অন্তরঙ্গে অর্থযোগ আর বহিরঙ্গে আনন্দযোগ হিসেবে সকলের জন্য উৎসবমুখর একটা উৎসবে পরিণত হয়, বাস্তবিকই হলও সেই মোতাবেক। সনাতন ধর্মের ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি মুসলিম ধর্মের অনুসারী ব্যবসায়ীরাও হালখাতাকেন্দ্রিক উৎসবকে সাঙ্গীকরণ করে নিল। এই সাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টার অংশহিসেবে কিছু জিনিস কেবল সাঙ্গীকৃত অবস্থায় থাকল না, তার আত্তীকরণও ঘটল।

এভাবে নববঙ্গাব্দের মুখ্যত প্রথম দিনটা দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে হালখাতার রং ধরে উৎসবের আমেজ নিয়ে এল। অন্যদিকে, পহেলা বৈশাখের দিনটা কেবল খাজনা আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলেই এই দিনটাতে নানারকমের উৎসবেও মেতে উঠল। বাংলার সমাজ যেহেতু কৃষি প্রধান এবং এর অর্থনীতি আজও কৃষি নির্ভর। ফলে কৃষি সংশ্লিষ্ট রীতি নীতি ও উৎসব একক কোন বৃত্তে আটকে রইল না। বিশেষ কোন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সমাজ-গোষ্ঠীতে সীমায়িত না থেকে তা ছড়িয়ে পড়ল সকলের মাঝে। এখনও বাঙালির ঘরে ঘরে সেই রীতি বহমান রয়েছে। এখনও পহেলা বৈশাখের দিন ধানের বীজ ছড়িয়ে কৃষকের বাড়ি আগমন ঘটে বরণের ডালি সাজিয়ে। উঠানে আগে থেকে রেখে দেয়া হয় পানি। তাতে দেয়া হয় কচি আম পাতা, দুর্বাঘাসসহ আরও নানাকিছু। উঠান লেপানো হয়। বাড়িতে আলাদা করে রান্নার আয়োজন থাকে। হালের গরুকে দেয়া হয় গোসল করানো হয়। ইত্যকার আয়োজনে পুরো দিন কেটে যায়।

আগ্রহোদ্দীপক বিষয় হল, পহেলা বৈশাখের আয়োজন এভাবে উৎসবের আমেজ ছড়াতে ছড়াতে এই অঞ্চলের, এই বঙ্গের, পূর্বভারতের, বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে প্রধান উৎসবে পরিগণিত হয়। লক্ষ্যণীয়, একদা যে উৎসব ছিল কেবল কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের, যে উৎসব ছিল কেবলই অর্থের কারবার করা ব্যবসায়ী সমাজ ও তার বান্ধবেষ্টিত ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই উৎসব নানা রূপে, নানা যোজন বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে সকলের উৎসব হয়ে উঠেছে। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এটাই একমাত্র উৎসব যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে। এমনকি যে বাউল, সমাজের প্রচলিত রীতি নীতিকে সাঙ্গীকরণ না করে চলে নিজের মতো তিনিও এই উৎসবে শামিল হন তার গান নিয়ে, একতারার বাদনে মনের মানুষকে খোঁজার বাসনায়।

ধনী গরীব মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সকলেই এই উৎসবে শামিল হন, আনন্দকে ভাগ করে নেয়ার লক্ষ্যে। পহেলা বৈশাখের উৎসবের সঙ্গে সকলেরই যোগ হওয়ার সুযোগ ঘটে। কারণ এই উৎসবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। যখনই কোন উৎসবের সঙ্গে অর্থনীতির নানা প্রান্তের যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় তখনই সেই উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে, পহেলা বৈশাখের উৎসবের ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে। এই উৎসবে কেউ ক্রেতা হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন আবার কেউ বিক্রেতা হয়ে আনন্দ উদযাপনের অংশ হন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরাও পহেলা বৈশাখের আনন্দোৎসব করেন। উনারাও নিজেদের মতো করে নিজেদের স্বাজাত্যবোধ বজায় রেখে উৎসবের রঙ ছড়ান। সেখানেও দেখা গেছে চমৎকার সব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। উনাদের অন্যান্য উৎসব নিজেদের মধ্যে বৃত্তবন্দী থাকলেও পহেলা বৈশাখের উৎসব তেমনটা নয়। বিদায়ী বর্ষের চৈত্রসংক্রান্তির দিন এবং নতুন বর্ষের প্রথম দিনকে ঘিরে পার্বত্য জেলাসমূহে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি' উদযাপিত হয়। এর নামকরণ হয়েছে বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজু এই শব্দগুলোর আদ্যক্ষর থেকে। উল্লেখ্য, এ উৎসবকে চাকমারা বিজু, মারমারা সাংগ্রাই, ত্রিপুরারা বৈসুক বলে অভিহিত করেন। পুরো পার্বত্য এলাকায় এর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে 'বৈসাবি' নামে।

পহেলা বৈশাখের সর্বজনীন রূপ নানানভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে সংহত এক অবস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এই সংহত রূপের প্রকাশ দেখতে পাই রাজধানী ঢাকার মঙ্গল শোভাযাত্রায়। প্রতিবছর মঙ্গল শোভাযাত্রার যে আয়োজন তাতে বাঙালির ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৪, কলাম ১

বালাগঞ্জ প্রতিদিন
balaganjprotidin.com

এপ্রিল ২০২৫ইং
বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরী

অপরূপ শ্রীভূমি

(শেষ পাতার পর)

ডাওকি নদীও টানে পর্যটকদের। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে ভারত সীমান্তে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদীর স্রোত বেড়ে গেলে নদী ফিরে পায় তার প্রাণ, আর হয়ে ওঠে আরো মনোরম। ডাওকি নদীর পানির স্বচ্ছতাও জাফলং-এর অন্যতম আকর্ষণ। পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষকে ঘিরে জাফলং-এ আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলা। এই মেলাকে ঘিরে উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠে পুরো এলাকা। বর্ষাকাল আর শীতকালে জাফলং-এর আলাদা আলাদা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। বর্ষাকালে বৃষ্টিস্নাত গাছগাছালি আর খরস্রোতা নদী হয় দেখার মতো। তাছাড়া পাহাড়ের মাথায় মেঘের দৃশ্যও যথেষ্ট মনোরম।

পাংতুমাই

পাংতুমাই সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নে অবস্থিত একটি সুন্দর গ্রাম। আমাদের প্রতিবেশী ভারতের মেঘালয়ের গহীন অরণ্যের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের বুকে নেমে এসেছে অপরূপ সুন্দর এক ঝরনাধারা। ঝরনাটি প্রতিবেশী দেশ ভারতের মধ্যে পড়লেও পিয়াইন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে উপভোগ করা যায় একে। সীমান্তের কাছাকাছি না গিয়েও ঝরনাটির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। ঝরনাটির স্থানীয় নাম ফাটাছড়ির ঝরনা। কেউ কেউ একে ডাকেন বড়হিল ঝরনা বলে। পান্তুমাই গ্রামকে যদিও অনেকে 'পাংথুমাই' বলে ডাকে কিন্তু এর সঠিক উচ্চারণ 'পান্তুমাই'। এটি জাফলং থেকে প্রায় ২০-২৫ কিমি দূরে। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ের নিচে, একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা এই গ্রামটির অবস্থান। মেঘালয় রাজ্যের সারি সারি পাহাড়, ঝর্ণা, ঝর্ণা থেকে বয়ে আসা পানির স্রোতধারা, আর দিগন্ত বিস্তৃত চারণভূমি দেখা যায় এই গ্রামটি থেকে। স্থানী-য়রা ঝরনাটিকে ফাটাছড়ির ঝরনা বা বড়হিল ঝরনাও বলেন। পাহাড় ঘেঁষা আঁকাবাঁকা রাস্তা। পাহাড়ি গুহা থেকে হরিণীর মতোই লীলায়িত উচ্ছল ভঙ্গিমায় চলা ঝরনার জলরাশি। গাঁয়ের মেঠো পথ, বাঁশ বাগান, হাঁটু জলের নদী পার হয়ে প্রতাপ্পুর গ্রাম। এর পরের গ্রাম পান্তুমাই।

বিছানাকান্দি

বিছানাকান্দি বাংলাদেশের সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত রুস্তমপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখানকার নদী দেখতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিছানাকান্দি পর্যটন এলাকাটি মূলত একটি পাথর কোয়েরি যেখানে নদী থেকে পাথর সংগ্রহ করা হয়। এই জায়গায় খাসিয়া পর্বতের বিভিন্ন স্তর এসে একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। খাসিয়া পর্বত থেকে নেমে আসা একটি ঝরনা এখানে একটি হ্রদের সৃষ্টি করেছে যা পিয়াইন নদীর সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে। এখানকার শিলা-পাথর গুলো একদম প্রাকৃতিক এবং এগুলো পাহ-াড়ি ঢলের সাথে পানির মাধ্যমে নেমে আসে।

সাদাপাথর

ভোলাগঞ্জ সিলেটের একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। ভোলাগঞ্জ দেশের সর্ববৃহত্তম পাথর কোয়ারির অঞ্চল। এখান থেকে ছাতক পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে বা রজ্জুপথ। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চমৎকার একটি গ্রাম ভোলাগঞ্জ। রোপওয়ে, পাথর কেয়ারী, নদী আর পাহাড়ে মিলে এই ভোলাগঞ্জ। সিলেট শহর থেকে ভোলাগঞ্জ এর দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। ধলাই নদী বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে প্লান্টের চারপাশ ঘুরে আবার একীভূত হয়েছে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সদরের কাছে ধলাই নদী মিলিত হয়েছে পিয়াইন নদীর সাথে। একশ একর আয়তনের রোপওয়েটি তাই পরিণত হয়েছে বিশেষ আকর্ষণীয় স্থানে। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল এলাকা চেরাপুঞ্জির অবস্থান ভারতের পাহাড়ী রাজ্য মেঘালয়ে। ধলাই নদীর উজানে এ রাজ্যের অবস্থান। খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় ঘেরা এ রাজ্যের দৃশ্য বড়ই মনোরম। ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে এলাকায় অবস্থান করে পাহাড় টিলার মনোরম দৃশ্যাবলি অবলোকন করা যায়। বর্ষাকালে চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির পানি ধলাই নদীতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মকালে অনেকে ধলাই নদীকে মরা নদী হিসাবে অভিহিত করলেও বর্ষাকালে নদীটি ফুলে ফেঁপে উঠে। ধলাই নদীর মনোলোভা রূপ, সবুজ পাহাড় বন্দী এলাকা জুড়ে অজস্র সাদা পাথর, আকাশের নীল ছায়া রেখে যায় পাথরে জমে থাকা স্ফটিক জলে। দূরের পাহাড়গুলোর উপর মেঘের ছড়াছড়ি, সাথে একটা দুটো ঝর্ণার গড়িয়ে পড়া। নদীর টলমলে হাঁটু পানির তলায় বালুর গালিচা। চিক চিক করা রূপালী বালু আর ছোট বড় সাদা অসংখ্য পাথর মিলে এ যেন এক পাথরের রাজ্য। প্রকৃতির খেয়ালে গড়া নিখুঁত ছবির মত সুন্দর এই জায়গাটির নাম ভোলাগঞ্জ।

রাতারগুল

তারগুল জলাবন সিলেটের গোয়াইনঘাটে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির জলাবন। পৃথিবীতে মিঠাপানির যে ২২টি মাত্র জলাবন আছে, 'রাতারগুল জলাবন' তার মধ্যে একটি। এই জলাবনের আয়তন ৩,৩২৫.৬১ একর। একে রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট হিসাবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর ৫০৪ একর এলাকাকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও ৩১ মে ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের বন অধিদপ্তর ২০৪.২৫ হেক্টর বনভুমিকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসবে ঘোষণা করে। এই এলাকাকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা (রাতারগুল) হিসাবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। চিরসবুজ এই বন গোয়াইন নদীর তীরে অবস্থিত (গোয়াইন নদী সারি গোয়াইন নদীর সাথে মিলিত হয়েছে) এবং চেঙ্গির খালের সাথে একে সংযুক্ত করেছে। এখানে সবচেয়ে বেশি জন্মায় করচ গাছ। এখানকার গাছপালা বছরে ৪ থেকে ৭ মাস পানির নিচে থাকে। বর্ষাকালে এই বন ২০-৩০ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। বাকি সারা বছর, পানির উচ্চতা ১০ ফুটের মতো থাকে। বর্ষাকালে এই বনে অথৈ জল থাকে চার মাস। তারপর ছোট ছোট খালগুলো হয়ে যায় পায়ে-চলা পথ। আর তখন পানির আশ্রয় হয় বন বিভাগের খোঁড়া বিলগুলোতে। সেখানেই আশ্রয় নেয় জলজ প্রাণীকুল।

বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এই মিঠাপানির জলাবনটিতে উদ্ভিদের দু'টো স্তর পরিলক্ষিত হয়। উপরের স্তরটি মূলত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত যেখানে নিচের স্তরটিতে ঘন পাটিপাতার (মুর্তা) আধিক্য বিদ্যমান। বনের উদ্ভিদের চাঁদোয়া সর্বোচ্চ ১৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও অরণ্যের ৮০ শতাংশ এলাকাই উদ্ভিদের আচ্ছাদনে আবৃত। বনের স্বাস্থ্য সন্তোষজনক। এখন পর্যন্ত এখানে সর্বমোট ৭৩ প্রজাতির উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বন মূলত প্রাকৃতিক বন হলেও পরবর্তিতে বাংলাদেশ বন বিভাগ, বেত, কদম, হিজল, মুর্তাসহ নানা জাতের জলসহিষ্ণু গাছ লাগিয়েছে। এছাড়া জলমগ্ন এই বনে রয়েছে হিজল, করচ আর বরুণ গাছ ;আছে পিঠালি, অর্জুন, ছাতিম, গুটিজাম। আছে বট গাছও।

লালাখাল

লালাখাল সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় একটি পর্যটন এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান। লালাখালের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সারি গোয়াইন নদী। সেই নদীতে অসংখ্য বাঁক রয়েছে। নদীটির কূলে পাহাড়ি বন, চা-বাগান এবং নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি রয়েছে। ভারতের চেরাপুঞ্জির ঠিক নিচেই লালাখালের অবস্থান। চেরাপুঞ্জি পাহাড় থেকে উৎপন্ন এই নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। লালাখালের পানি নীল। মুলতঃ জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে আসা প্রবহমান পানির সাথে মিশে থাকা খনিজ এবং কাদার পরিবর্তে নদীর বালুময় তলদেশের কারনেই এই নদীর পানির রঙ এরকম দেখায়। লালাখাল নদীতে অসংখ্য বাঁকের দেখা মেলে। এ নদী দিয়েই পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। জায়গাটার নামের সঙ্গে 'খাল' শব্দ যুক্ত হলেও এটি মূলত একটা নদীরই অংশ। নদীর নাম সারি। কেননা, চেরাপুঞ্জি পাহাড় থেকে বেয়ে আসা পানি গড়িয়ে চলেছে লালাখাল দিয়ে। লালাখালকে কেন লালাখাল বলা হয়, তা জানা যায়নি।

লোভাছড়া

লোভাছড়া সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ ইউনিয়নে অবস্থিত এক মনোহরিণী স্থান। মূলত এর নাম লোভাছড়া চা বাগান। আর এই চা বাগানের সূত্র ধরেই পুরো গোটা একটা বিশাল এলাকার নাম হয়েছে লোভাছড়া।

মুলাদি বাজার যাওয়ার পথেই পড়বে 'লোভাছড়া চা বাগান'। কানাইঘাট উপজেলার লক্ষীপ্রসাদ ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত এই সীমান্তবর্তী লোভাছড়া নদীর পাশেই ব্রিটিশ আমলে প্রায় ১৮৩৯ একর জমির উপর ইংরেজ মালিকানায় গড়ে ওঠে লোভাছড়া চা-বাগান। বাগানের উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের একটি সুন্দর পিকনিক স্পট ও লালাখাল চা-বাগান অবস্থিত। পাহাড়ের কোল জুড়ে গাছপালার সবুজ বর্ণিল রঙয়ে আচ্ছাদিত হয়ে আছে লোভাছড়া চা-বাগান। চা বাগান, প্রাকৃতিক লেক ও ঝরনা, ঝুলন্তসেতু, মীরাপিং শাহর মাজার, মোগল রাজা-রানির পুরাকীর্তি, প্রাচীন দীঘি, পাথর কোয়ারি ও বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন। লোভাছড়ার চা বাগান রাস্তার দুই পাশে সারি সারি গাছ, ঘন সবুজ বনানী প্রাকৃতিক লেক আর স্বচ্ছ পানির ঝরনা। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় খাসিয়া-জৈইন্তা পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে বালুভরা বেশ কিছু স্বচ্ছ পানির নদী। এরমধ্যে লোভা নদী অন্যতম। লোভার মুখ হচ্ছে সুরমা ও লোভা নদীর সঙ্গমস্থল। পাহাড়, মেঘ আর স্বচ্ছ নদীর পানির সঙ্গে নীল আকাশের মিতালি।

হাকালুকি হাওর

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর। এটি মৌলভীবাজার সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারএবং মৌলভীবাজারের বড়লেখা, জুরী, কুলাউড়া উপজেলায় এর বিস্তৃতি। হাওরের আয়তন ১৮, ১১৫ হেক্টর। এটি সিলেট জেলার দর্শনীয় স্থান সমুহের মধ্যে একটি অন্যতম স্থান। বর্ষাকালে বিস্তৃত জলরাশি এ হাওরের রূপ ঠিক যেন ভাসমান সাগর। আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। জলের মাঝে মাঝে দুই-একটি বর্ষীয়ান হিজল, তমাল বৃক্ষ। অথচ শীতকালে বিস্তৃত এই হাওর ধু-ধু সবুজপ্রান্তর, কোথাও বা ধান ক্ষেত এবং খানাখন্দ নিচু ভূমিতে প্রায় ২৩৬টি বিলের সমষ্টি। হাকালুকি হাওর মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সংরক্ষিত জলাভূমি। শীত মৌসুমে এশিয়ার উত্তরাংশের সাইবেরিয়া থেকে প্রায় ২৫ প্রজাতির হাঁস এবং জলচর নানা পাখি পরিযায়ী হয়ে আসে। এছাড়া স্থানীয় প্রায় ১০০ প্রজাতির পাখি সারাবছর এখানে দেখা মেলে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কলকাকলি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটককে দুর্বার আকর্ষণে রোমাঞ্চের হাতছানি দেয়। হাকালুকি হাওরে পরিযায়ী হাঁসের মধ্যে চখাচখী, রাজসরালী, গরাদমাথা রাজহাঁস, ধলাবেলে হাঁস, গাডওয়াল, ইউরেসীয় সিথীহাঁস, টিকিহাঁস, পাতিহাঁস ম্যার্গেঞ্জার প্রভৃতির দেখা মেলে। দেশি প্রজাতির মধ্যে বেগুনি কালেম, পানমুরসী, পাতিকুট, ডাহুক, ইউরেশীয় মুরগি চ্যাগা, ল্যাঞ্জা চ্যাগা, রাঙ্গাচ্যাগা, জলাপিপি, ময়ূরলেজা পিপি, পাতি জিরিয়া, হাট্টিটি, ভূবনচিল, শঙ্খচিল, বিলুপ্ত প্রায় কুড়াল ঈগল, বড়খোঁপা ডুবুরি, ছোট পানকৌড়ি, খয়রা বক, ধূসর বক, শামুক খোল প্রভৃতি পাখি অন্যতম। হাকালুকি হাওরে অনেক প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। চিতল, আইড়, বাউশ, পাবদা, মাগুর, শিং, কৈ প্রভৃতি মাছ এখানে রয়েছে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বিলুপ্ত প্রায় মাকনা হাওর অঞ্চলের পুটি, হিঙ্গাজুর, হাওয়া প্রভৃতি বিলে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এছাড়া শাপলা, শালুক, পদ্ম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ ও আশাব্যঞ্জকহারে এখানে রয়েছে।

ডিবির হাওর

সৌন্দর্যের লীলাভূমি মেঘালয়ের পাদদেশে ঝর্ণা বেষ্টিত ডিবির হাওর লাল শাপলার বিল নামে পরিচিত। আমাদের জাতীয় ফুল লাল শাপলার বিল ডিবির হাওর। প্রতিবছর অসংখ্য পাখি আসে এই ডিবির হাওরে। ভোরের লাল শাপলা, পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য্যে, সাথে পাখির কিচির মিচির এ যেন আসলেই এক প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। অপরূপ সৌন্দর্যের পাশাপাশি এখানে রয়েছে ইতিহাস। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রিটিশ শাসিত ভারত উপমহাদেশের শেষ স্বাধীন রাজ্য ছিল জৈন্তাপুর। শ্রীহট্ট ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকা তখন মোঘলসাম্রাজ্যের ছিলো। তখন জৈন্তিয়া তার পৃথক ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছিল। প্রায় ৩৫ বছর স্বাধীন রাজ্য হিসেবে পরিচালিত হয়।

হযরত শাহজালাল (রা.) মাজার শরীফ

শাহজালাল (জন্ম : তুরস্ক ৬৭১ হি. ১২৭১ খ্রি.- মৃত্যু : ৭৪০ হি. ১৩৪১ খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত সুফি দরবেশ। তাঁর পুরো নাম শায়খ শাহ জালাল কুনিয়াত মুজাররদ। ১৩০৩ খ্রি. সালে ৩২ বৎসর বয়সে ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে অধুনা বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে এসেছিলেন বলে ধারনা করা হয়। সিলেট আগমনের সময় কাল নিয়ে যদিও বিভিন্ন অভিমত রয়েছে; তদুপরি শাহ জালালের সমাধির (ঐধুৎধঃ ঝযধযলধষধষ গধুধৎ) খাদিমগণের প্রাপ্ত পারসী ভাষার একটি ফলক লিপি হতে উল্লেখিত সন-তারিখই সঠিক বলে ধরা হয়পারসী ভাষায় লিখিত ফলক লিপি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সিলেটে তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের বহুল প্রচার ঘটে সিলেট বিজয়ের পরে শাহ জালালের সঙ্গী অনুসারীদের মধ্য হতে অনেক পীর দরবেশ এবং তাদের পরে তাদের বংশধরগণ সিলেট সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসবাস করেন। শাহজালাল ও তাঁর সফরসঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়ার সিলেট আগমন ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সিলেটেই কবর দেয়া হয়।

জন্মগত ভাবে শাহ জালাল দরবেশ পরিবারে জন্ম নিয়েছেন। হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার চত্বরের উত্তর দিকে একটি পুকুর রয়েছে। এ পুকুরে রয়েছে অসংখ্য গজার মাছ। এসব মাছকে পবিত্র জ্ঞান করে দর্শনার্থীরা ছোট ছোট মাছ খেতে দেয়। পুকুরের পশ্চিম কোণে ছোট মাছ বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। পুকুরে অজুর ব্যবস্থাও আছে। ২০০৩ সালের ৪ ডিসেম্বর বিষ প্রয়োগে পুকুরের প্রায় ৭শ'রও বেশি গজার মাছ হত্যা করা হয়। ফলে পুকুরটি গজার মাছ শূন্য হয়ে পড়ে। মরে যাওয়া মাছগুলোকে মসজিদের পশ্চিম দিকের গোরস্থানে পুঁতে ফেলা হয়। পুকুরটি মাছ শূন্য হয়ে যাওয়ার পর হযরত শাহজালাল (র.) এর অপর সফরসঙ্গী মৌলভীবাজারের শাহ মোসত্মফার (র.) মাজার থেকে ২০০৪ সালের ১১ জানুয়ারি ২৪ টি গজার মাছ এনে পুকুরে ছাড়া হয়। বর্তমানে পুকুরের গজার মাছের সংখ্যা কয়েক শ'তে দাঁড়িয়েছে বলে জানা যায়।

বাংলার সুলতান আবু মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহের মন্ত্রী মজলিশে আতার আমলে ১৪০০ সালে দরগাহ চত্বরে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ১৭৪৪ সালে বাহরাম খাঁ ফৌজদারের সময় এটি পুনর্নির্মিত হয়। বর্তমানে এটি সিলেট শহরের অন্যতম একটি মসজিদ।

শাহী ঈদগাহ

শাহী ঈদগাহ নামক স্থানটি নানা কারণে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। এখানেই হাদা মিয়া ও মাদা মিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থান হয়েছে। ভারতের অহিংস আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতো নেতাদের পাদস্পর্শে ধন্য স্থানটি। অতীতে সিলেটের বড় বড় সমাবেশের স্থানও ছিল এটি। আর প্রতি বছর ঈদ জামায়াতে লোক সমাগমের বিষয়টি তো বলাই বাহুল্য। দেশের প্রাচীনতম ঈদগাহ এটি। মনোমুগ্ধকর কারুকার্যময় এই ঈদগাহটি মোগল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ নির্মাণ করেন। এখানে এক সাথে প্রায় দেড় লাখ মুসল্লী ঈদের জামাত আদায় করতে পারেন। ঈদগাহর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম। অনুপম কারুকার্যখচিত এই ঈদগাহের মূল ভূ-খণ্ডটি ২২টি সিঁড়ি মাড়িয়ে উপরে উঠতে হয়। এরপরই ১৫টি গম্বুজ সজ্জিত ঈদগাহ। সীমানা প্রাচীরের চারদিকে রয়েছে ছোট বড় ১০টি গেইট। ঈদগাহের সামনে অজুর জন্য বিশাল পুকুর অবস্থিত। জানা গেছে, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সৈয়দ মোহাম্মদ হাদী ও সৈয়দ মোহাম্মদ মেহেদী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ইংরেজদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় শহীদ হন।

পহেলা বৈশাখ আমাদের ঐতিহ্য

মাহমুদুল হক আনসারী

বাংলা নববর্ষ আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও সংস্কৃতির নাম পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ অর্থ হলো বাংলা সনের নতুন মাস। বাংলার গণনার নতুন সংস্কৃতি অধ্যায় শুরু হয় বৈশাখ দিয়ে। এই বৈশাখ মাসের সাথে গণনার শুরু হয় হালখাতায়। বিগত বছরের সব হিসেব নিকেশ সমাপ্ত করে বৈশাখের প্রথম দিন হালখাতা লিখা শুরু হয়। বাংলার ঘরে ঘরে বৈশাখ মাস আনন্দ, উদ্দীপনা নতুন কিছু খাবার আশা নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরে আসে। বৈশাখ মানে বাঙ্গালি জাতির সংস্কৃতি হাসি কান্না উল্লাসের মাস।

বৈশাখ মাস জুড়েই বাংলার প্রতিটি পাড়া মহল্লা ঘরে ঘরে নবান্নে উৎসব চলে। পিঠা, পায়েস, সংস্কৃতি, আউল বাউল গানের আসর বসে। গ্রাম্য ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি লালনে, পালনে নানা প্রকারের অনুষ্ঠানাদি অত্যন্ত আনন্দ মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ বৈশাখ মাসটি বরন করতে উদগ্রিব থাকে। বৈশাখ হলো বাঙ্গালি জাতির অনুপ্রেরণা। ভালো মন্দ, হাসি কান্না, উৎসব, অনুষ্ঠানের একটি অধ্যায়। বৈশাখকে বরণ করা লালন পালনে সংস্কৃতির মিলনে মেলবদ্ধ হওয়া জাতীয় একটি ঐক্যবদ্ধ চরিত্র।

পহেলা বৈশাখ হচ্ছে লোকজের সঙ্গে নাগরিক জীবনের একটি সেতুবন্ধন। ব্যস্ত নগর কিংবা গ্রামীণ জীবন যেটাই বলা হোক না কেন, এই নববর্ষই বাঙালি জাতিকে একত্র করে জাতীয়তাবোধে। এ অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রত্যেকটি বাঙালির কাছে শিকড়ের মিলনমেলায়। ধর্ম, বর্ণ সব পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে বাঙালি জাতি এই নববর্ষকে সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। আসছে বাঙালির প্রাণের উৎসবের দিন পহেলা বৈশাখ। বছরের প্রথম দিনটি বাঙালিরই শুধু নয়, বাংলা ভাষাভাষী আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন-জগতে স্বপ্নময় নতুন বছরের শুভ সূচনা ঘটায়। জীর্ণ-পুরোনোকে পেছনে ফেলে সম্ভাবনার নতুন বছরে প্রবেশ করে বাঙালি জাতি।

পহেলা বৈশাখ, বাংলা সনের প্রথম দিন। এ দিনটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরাসহ দেশ-বিদেশে বসবাসরত প্রত্যেকটি বাঙালি নববর্ষ হিসেবে পালন করে। সে হিসেবে এটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন প্রাণের উৎসব। বাঙালি এই প্রাণের উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে আবহমান বাংলার কৃষি। গ্রামীণ মেলাগুলো পরিণত হয় উৎসবে। এই উৎসবের রং একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়তে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে নিয়েছে বারবার। দেশ স্বাধীনের পর বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীকে পরিণত হয় বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। উৎসবের পাশাপাশি স্বৈরাচার অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এসেছে পহেলা বৈশাখের আয়োজনে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সরকার বাংলাদেশের চাকরিজীবীদের জন্য ঈদ-পূজার বোনাসের মতো 'বৈশাখী ভাতা' চালু করেছে। এটিও বড় আনন্দের কথা।

কৃষি কৃষকের জন্য পহেলা বৈশাখ একটি নতুন দিন। কৃষি পণ্য উৎপাদন বাজারজাত লোকজ সংস্কৃতি ব্যপকভাবে আদান প্রদান বৈশাখের বৈশিষ্ঠ্য।

কৃষিকাজ হলো বিশেষ ঋতুনির্ভর। ফসল বোনা, ফসলের সময়ভিত্তিক যত্ন বা পরিচর্যা, ফসল কাটাসহ যাবতীয় কৃষিকাজ বাংলা সন-তারিখ পঞ্জিকা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করা হতো। বাংলায় হরেক রকম মেলার দিন-তারিখও নির্ধারিত ছিল বাংলা সনের সঙ্গে। শুধু ফসল আর উৎসব নয়, বাঙালির কৃষকের পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যুসহ জীবনের সব বিষয়েই বাংলা সন ছিল একক ও অনন্য। ভারতবর্ষে খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা তথা ফসলি সন ১৫৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রবর্তন করেন। তবে শুরুর দিন কিন্তু ১ সাল ছিল না, ছিল ৯৬৩ সাল। তখন এ দেশে হিজরি সাল প্রচলিত ছিল। হিজরি বছরটিকে ঠিক রেখেই নতুন একটি বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়। বাংলা দিনপঞ্জির সঙ্গে হিজরি ও খ্রিস্টীয় সালের মৌলিক পার্থক্য হলো হিজরি সাল চাঁদের হিসাবে এবং খ্রিস্টীয় সাল ঘড়ির হিসাবে চলে।

এ কারণে হিজরি সালে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনে। ইংরেজি দিন শুরু হয় মধ্যরাতে। আর বাংলা সনের দিন শুরু হয় ভোরে, সূর্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই সূর্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বর্তমান পরিচিত পান্তা খাওয়া বাঙালির পহেলা বৈশাখের উৎসব। বাংলা সন ও বাঙালির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশে আর আগের মতো নেই। এখন মানুষ লেখাপড়া শিখছে। গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে নানা উপাদান যুক্ত হয়ে নতুন গতিবেগ সঞ্চার হয়েছে এবং এতে অনেকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, হাতে নগদ পয়সা আসার উৎস সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যাসের। এই পরিবর্তনের ফলে বাঙালির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উপাদান এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বাংলা সনও আর এখন একাধিপত্য করতে পারছে না। বরং গ্রামজীবনের নতুন ধারা বা শহরের বাস বা বিদেশে চাকরি-বাকরির সুবাদে ইংরেজি সালের ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু আমাদের জাতিসত্তায় আছে বঙ্গাব্দ।

বাংলা সন কিংবা বঙ্গাব্দ বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা সনকে উদযাপন করা মানে নিজের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা। নগর সংস্কৃতিতে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ কেবল এক দিনের উৎসব-আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং জাতীয় সংস্কৃতিতে এর প্রভাব এখনো অনস্বীকার্য। বিশ্বের সব জাতিই নিজ সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বর্ষবরণ পালন করে।

আমাদের দেশে অনেকে পহেলা বৈশাখে নববর্ষে বাউল বা বৈরাগীর বেশ ধারণ করে উৎসব পালন করে। বাংলা নববর্ষের ভেতর দিয়ে মূলত দেশের আপামর জনসাধারণ নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে। পহেলা বৈশাখের উৎসবের মধ্য দিয়ে এ দেশের নর-নারী এ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। নতুবা আমাদের নতুন প্রজন্ম বাংলার ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতির কিংবা বাংলা ঋতুর কথা ভুলেই যেত।

আজকের সময়ে বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তিকালীন সরকার দেশ পরিচালনা করছেন। আট মাসের অন্তর্বর্তিকালীন এই সরকার জনগনের হৃদয়ে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। জনগনের প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। জনগনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সামাজিক চাহিদা পূরণে স্বস্তি দেখা যাচ্ছে। এই সরকারের প্রধাণ উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসের প্রতি প্রান্তি জনগোষ্টির অকুণ্ঠ সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবী ব্যাপি প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশকে উন্নত দেশের সারিতে নিয়ে যেতে বলিষ্ঠ ভূমিকা লক্ষ করছি। ফলে দেশ ও জনগন পহেলা বৈশাখের নববর্ষের আনন্দের সাথে সরকারের অব্যাহত সফলতায় খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশ ও জাতির মঙ্গলে জনগণের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত দেশপ্রেম জাগ্রত হোক, দেশ ও জনগনের মধ্যে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ তৈরি হোক। সরকারের প্রচেষ্ঠায় খুলে যাক সম্ভাবনার আরো নতুন দুয়ার। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। অর্থনীতির সফলতায় দেশ এগিয়ে যাক বাংলা নববর্ষে প্রত্যাশা জনগনের।

লেখক : সংগঠক, গবেষক, কলামিস্ট
ইমেইল:
mh.hoqueansari@gmail.com

পহেলা বৈশাখ

কল্যাণ বয়ে আনুক নতুন বছর

সম্পাদকীয়

‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো’–চিরায়ত সেই আহ্বানের মধ্য দিয়ে আজ পূর্ব দিগন্তে উদিত হবে নতুন বছরের প্রথম সূর্য। শুরু হবে নতুন বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ, নতুন বাংলা সন ১৪৩২। গানে, কবিতায়, চিত্রকলায় কোটি প্রাণের উচ্ছ্বাসে বরণ করে নেওয়া হবে নতুন বছর। তাই আজ মঙ্গলের প্রত্যাশায়, কল্যাণের প্রত্যাশায়, শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভালোবাসার প্রত্যাশায় পহেলা বৈশাখের প্রত্যুষে প্রতিটি বাঙালির কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হবে সেই উজ্জীবনী আবাহন।

যা কিছু জীর্ণ, পুরাতন ও অকল্যাণকর–সব দূর হয়ে যাক। প্রাণের বন্যায় আনন্দের ডালি সাজিয়ে আসুক নতুন বছর। বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেওয়ার এই যে উৎসব, তা আজ বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাঙালির সংস্কৃতির এক প্রধান ধারকে পরিণত হয়েছে।

নানা আয়োজনে যেমন দেশজুড়ে বরণ করে নেওয়া হবে নতুন বছর, তেমনি পৃথিবীর যেখানেই বাঙালির বসবাস রয়েছে সেখানেই দৃশ্যমান হবে এই উৎসব। প্রকাশ ঘটবে নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসার।

সময়ের বৃত্ত পূরণ করে প্রতিবছরই আসে পহেলা বৈশাখ। সেই সঙ্গে প্রতিবছরই থাকে উৎসবের আয়োজন।

প্রতিবছরের মতো এবারও সারা দেশে ব্যাপক আয়োজনে দিবসটি উদ্যাপিত হবে। আজকের দিনটি শুরু হবে রমনায় ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ দেবে লাখো বাঙালি। শুধু রমনা বা চারুকলা নয়, রাজধানীজুড়েই আজ থাকবে উৎসবের আমেজ। টিএসসি চত্বর, ধানমণ্ডি লেক বা রবীন্দ্রসরোবরসহ রাজধানী ঢাকার আনাচ-কানাচে নববর্ষ উদ্যাপনের অসংখ্য আয়োজন চোখে পড়ে। রাজধানীর বাইরেও প্রতিটি শহরে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও থাকবে বর্ষবরণের নানা আয়োজন। গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বসবে চৈত্রসংক্রান্তি ও বর্ষবরণের মেলা। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে উদ্যাপন করা হবে হালখাতা উৎসব। বলা যায় না, হয়তো অন্ধকারের শক্তিও তাদের আক্রোশ মেটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই রমনাসহ যেখানেই বর্ষবরণের আয়োজন করা হবে সেখানেই নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা। আমরা আশা করি, নির্বিঘ্ন হবে বাঙালি বর্ষবরণ তথা প্রাণের উৎসব উদ্যাপন।

আজকের এই বিশেষ দিনে সবার একটাই চাওয়া, ‘মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’ নববর্ষে আমাদের অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ।

পহেলা বৈশাখ : বাঙালির

(২ এর পাতার পর)

অসাম্প্রদায়িক মননচর্যার চিত্রই উপস্থাপন করা হয়। এখানে নানামোটিফে যা কিছু হাজির করা হয় তার সঙ্গে রয়েছে বাঙালির চিরায়ত সাহচর্য। এই সব মোটিফের ভেতর দিয়ে তার বিশ্বাসও উন্মীলিত হয়। সেই বিশ্বাসে ধর্মীয়বোধের চেতনা হাজির যেমন থাকতে পারে, তেমনই থাকতে পারে লোকধর্মের অন্তরঙ্গ উপস্থিতিও। এ কারণে মঙ্গল শোভাযাত্রা মূলত বাঙ্গালির হাজার বছরের পথচলার সম্মিলিত সহাবস্থানের প্রতীকী উপস্থাপনা। যার মধ্যে আমরা অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ যেমন রচনা করি তেমনি আমাদের প্রত্যয়ের অনুষঙ্গগুলোকেও হাজির রাখি। বাঙ্গালি সত্তার চিরন্তন রূপের যে আধার ও আধেয় সর্বৈবরূপের প্রকাশ ঘটে নব বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে।

রমনার বটমূলে ১৩৭২ বঙ্গাব্দ থেকে পহেলা বৈশাখের উৎসবের আয়োজন করে আসছে ছায়ানট। গানে গানে তাদের যে আহবান, তা মূলত বাঙ্গালীর প্রার্থনা সঙ্গীত বিশেষ। এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ। / তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে, / বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।। / যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি, / অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।। / মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা। / রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি, / আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ। / মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক।’ এ গানের ভেতর দিয়ে বাঙালি প্রতি বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে নতুন করে বাঁচতে শেখার পুণ্যমন্ত্রই উচ্চারণ করে।

দেশের প্রায় সকল বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে বঙ্গাব্দ নববর্ষের প্রথম দিনে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উৎসবের আয়োজন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় এই উৎসবের আয়োজন এত বেশি বর্ণাঢ্য হয়ে থাকে যে তা দেখার জন্য দেশের ভেতরের এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায় তো যায়ই দেশের বাইরে থেকেও অনেকেই আসেন। প্রবাসী বাঙ্গালিদের অনেকেই দেশে আসার ক্ষেত্রে পহেলা বৈশাখের উৎসবে যেন শামিল হতে পারেন, নতুন প্রজন্মকে যেন পহেলা বৈশাখের বর্ণময় উৎসবের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে পারেন সেদিকেও বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন। কেননা, এই উৎসবকে ঘিরে গ্রামবাংলা ও নগর জীবন যেভাবে সাজ সাজ রবে সেজে ওঠেন তার কোন তুলনা আক্ষরিক অর্থেই হয় না।

বাংলার ঘরে ঘরে এই উৎসব যেন প্রাণের বান ডেকে আনে। বাঙ্গালি জীবনে বিবিধ সমস্যায় আকীর্ণ। এখানে আনন্দ যেমন আছে তেমন দুঃখ আছে। এর প্রকৃতিই এমন কখনও বন্ধুর কখনও সৌহার্দ্যপূর্ণ। বাঙ্গালি এর মধ্যে দিয়েই রপ্ত করেছে বাঁচতে শেখার মন্ত্র। এবং সেই মন্ত্রকে কীভাবে নিজের জীবনের চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করেছেন, তার অনুপম দৃষ্টান্ত হলো পহেলা বৈশাখের উৎসব।

উৎসবকে কেন্দ্র করে নদী জেগে ওঠে নৌকাবাইচকে ঘিরে। গ্রামের বটতলায় প্রাণের জাগরণ ঘটে নাগরদোলার মতো নানা আয়োজনের উপস্থিতিতে। হাটে মাঠে ঘাটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও জারি সারি ভাটিয়ালি গান থেকে শুরু করে হাল আমলের গানেরও তুফান ওঠে। রকমারি পিঠার মনোহরা গন্ধে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয় থেকে লোকালয়ে। মোরগ লড়াই যেমন হয়, তেমনি ষাঁড়ের দৌড়- ঘোড় দৌড়ের আয়োজন হয়। বেদে বেদেনিরা সাপের খেলার আর গানের ঝাঁপি খুলে বসে। চরকি ওড়ে, ঘুড়ির মেলা বসে, নানা রংয়ের পুতুলের উপস্থিতির সঙ্গে থাকে পুতুল নাচের আয়োজনও। বাঁশিবিক্রেতা বাঁশি বাজিয়ে মুখর করে তোলে মেলা প্রাঙ্গণ। এই উৎসবকে ঘিরে যাত্রাপালার আয়োজনও করা হয়। সেখানে রাধা কৃষ্ণের বিরহে যেমন আকুল হয় মানুষের মন তেমনি লাইলি মজনুর বিরহগাঁথাও তাদেরক ব্যথিত করে। বাংলার কত রূপ যে আছে, যে রূপের তালাশ করে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল, জীবনানন্দ। সেই রূপের সকল আধার যেন হাজির হয় বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখের উৎসবে। ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর’। জীবনানন্দ দাশের অমোঘ এই উচ্চারণের সত্যতা কেবল বাংলার প্রকৃতিতে মেলে না, তার উৎসব-পার্বণেও হাজির হয়।

বাঙ্গালীর গণমাধ্যমেও বৈশাখ, নববর্ষ, চৈত্রসংক্রান্ত্রি, বিদায়ী বর্ষও নানানভাবে হাজির হয়। এসবকে ঘিরে নানারকমের আয়োজন থাকে। কেবল বিনোদনের জায়গা থেকে নয়, ফিচার বা লাইফস্টাইলের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর থেকেও সৃজন-মননশীল দৃষ্টিকোণ থেকেও এর গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়। যার সর্বৈব প্রকাশ ঘটে পহেলা বৈশাখের ক্রোড়পত্র ও বিশেষ আয়োজনসমূহকে ঘিরে।

একটা উৎসব কীভাবে সর্বজনীন হয়ে উঠে। কীভাবে তার প্রসার ও পসার ঘটতে পারে, তার নজির রয়েছে বাঙ্গালির পহেলা বৈশাখের উৎসবে। পৃথিবীতে একটা উৎসবের এরকম ব্যাপকতা বিস্তার গ্রহণযোগ্যতা ও মান্যতা বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই।

সিলেটের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা

খালেদ উদ-দীন
কবি, প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী সিলেট বিভাগ একটি প্রাচীন ভূ-খন্ড। বিশ্বমানচিত্রে এর অবস্থান ২৩০৫৯-২৫০১৩ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০০৫৪-৯২০২৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা ৫৫ ফিট। এর আয়তন ১২৩৯৫ বর্গকিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এই অঞ্চলের উত্তরে মেঘালয়, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সিলেট অঞ্চলের পরিচয় দিতে গিয়ে ডেভিড ও ন্যান্সি স্প্রাট (১৯৮৭:১) যথার্থই বলেন,

‘The district comprises in the main, the large eastern bulge of the northern part of the country, being surrounded to the north, east and south by mountainous areas of India, and opening out in the west to the vast low-lying-Brahmaputra-Ganga delta system.’

পাণিনির অষ্টধ্যায়ীতে সূরমস (৪-১-১৭০) নামে যে একটি জনপদের কথা বলা হয়েছে তা সুরমা উপত্যকা বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ‘হিউ এন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সিয়ুকি (ংরুঁ-শর) গ্রন্থে শি-লি-চ-ট-ল বলে একটি রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেটাই প্রাচীন শ্রীহট্ট এবং এখানে শ্রীহট্টকে একটি স্বতন্ত্র প্রাচীন রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।’ এছাড়া আরব পর্যটক সোলায়মান ছয়রাফী বঙ্গোপসাগর অতিক্রমকালে বাংলার বিখ্যাত বন্দর সেলাহেটের কথা উল্লেখ করেছেন। নবম শতাব্দীতে, দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ‘শ্রীহট্ট মন্ডল’ এবং একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ গোবিন্দ কেশব দেবের তাম্রশাসনের উল্লেখ রয়েছে শ্রীহট্টরাজ্য বলে। আর প্রায় একই সময়ে মহাপন্ডিত আলরেবুনী তাঁর বিখ্যাত ‘কিতাবুল হিন্দ’ গ্রন্থে এ রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন ‘লিলাহাত’ বলে।

সিলেট অঞ্চলের ইতিহাসের শুরু সপ্তম শতকের কাল থেকে। এই সময় এই অঞ্চল কামরুপের অধীন ছিল। তবে প্রাচীন গৌড় লাউড় ও জৈন্তা রাজ্যসহ ইটা, তরফ প্রভৃতি সামন্তরাজ্য সিলেটের অন্তর্ভূক্ত ছিল। হযরত শাহজালাল (র.) চতুর্দশ শতাব্দীতে সিলেট জয় করেন। এর পরবর্তী দু'শতকের ইতিহাসও অস্পষ্ট। ১৬১২ সালে বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁর সেনাবাহিনীর হাতে সিলেটের পাঠান শাসক খাজা ওসমানের পরাজয় হয়। মির্জা নাথনের ‘বাহার-ই-স্থান-ই গায়েবী’ গ্রন্থে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। বাংলার নবাব মীর জাফরের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে সিলেটের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সিলেটের প্রথম ইংরেজ কালেক্টর উইলিয়াম ম্যাকপীস থ্যাকারে ১৭৭২ সালে সিলেট আসেন। ১৮৭৪ সালে সিলেটকে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এতে সিলেটবাসীরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ, ১৮৭৮ সালে হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এবং ১৮৮২ সালে সিলেট সদর মহকুমাকে বিভক্ত করে দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলভীবাজার) মহকুমা গঠন করা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে সিলেট আবার আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

বর্তমান সিলেট বিভাগ ইতিহাসের বহু ভাঙাগড়ার ফল। এই ভূখন্ডের আয়তন বারবার পরিবর্তিত- কখনও সংকুচিত, কখনও সম্প্রসারিত- হয়েছে। বর্তমানরূপ সংকোচনের ফল। সিলেটের কিছু অংশ কিশোরগঞ্জ এবং কিছু অংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভগের সময় সিলেট করিমগঞ্জ মহকুমার রাতাবাড়ি বদরপুর, পাথরকান্দি থানা ও করিমগঞ্জ থানার অংশবিশেষ সিলেট থেকে বিচ্যুত হয়ে আসামের কাছাড় জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৮৪ সালে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়। ১৯৯৫ সালে সিলেট বিভাগ গঠিত হয়।

প্রসঙ্গ: সিলেটি নাগরী লিপি

সিলেটি নাগরী লিপি বাংলা ভাষার একমাত্র আঞ্চলিক লিপি। সিলেটি মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ লিপির ব্যাপক পঠন পাঠন একসময় হতো। পুঁথিপত্র লেখা চলত, যার দরুণ এ লিপিকে সিলেটের এক ব্যতিক্রমি সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয় করেন। এর এক শতাব্দী পর ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সরকার সৈয়দ নাসির উদ্দিন এর নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী সিলেট অভিযানে পাঠান। সিলেটে তখন হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের শাসন। যাত্রা পথে কাকতালীয় হযরত শাহজালাল (র.) এবং তাঁর সঙ্গী সাথী ৩৬০ আউলিয়ার সাথে দেখা হয়। দরবেশ সৈয়দ নাসির উদ্দিন আধ্যাত্ম-গুরু হিসেবে হযরত শাহজালাল (র.) এর নেতৃত্ব মেনে নেন এবং উভয় বাহিনী সম্মিলিতভাবে হিন্দুরাজা গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। পীর-আউলিয়াদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে শেষ পর্যন্ত বিনা রক্তপাতে সিলেটে মুসলমানদের বিজয় হয়। এ বিজয় সারা বাংলার বুকে সুদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। পীর আউলিয়াদের প্রায় সকলেই এদেশের অধিবাসী বনে যান। ফলে তাঁদের ফেলে আসা পরিবার পরিজনদের অনেকেও এসে যান এখানে। অপরদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের এক হিড়িক পড়ে যায়। আরব- পারস্যের প্রভাবে ধর্মের সাথে সাথে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাটাও নতুন পথে যাত্রা করার অবকাশ পায়। দেব-দেবী নির্ভর কাহিনীর বদলে শুরু হয় সুফী ইজমের চর্চা এবং সুফী তত্ত্বমূলক মানবিক প্রণয় কাহিনী রচনার সূত্রপাত ঘটে। এতে বাহিরাগত মুসলমানগণ কঠিন-জটিল বাংলা লিপি নিয়ে একটা বিরাট ধাঁধাঁর সম্মুখীন হন। এ কারণে উত্তর ভারতের দেব নাগরী অধ্যুষিত এলাকা থেকে আগত ৩৬০ আউলিয়ার অন্তর্গত কতিপয় পীর আউলিয়ার প্রচেষ্টায় খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের ভেতরেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ৩০ বর্ণে তৈরী আরবী বর্ণমালার সংখ্যার ভিত্তিতে সিলেটি নাগরী বর্ণ নামে বিকল্প লিপি তৈরী হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নাগরী লিপিতে রচিত পুঁথির সংখ্যা প্রায় শ-খানেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ছাদেক আলীর হালতুন্নবী, মহব্বত নামা, হাসর মিছিল। মুন্সী ইরপান আলীর ছয়ফুল বেদাত, শাহজালালের তয়ারিখ, রাহাত নামা। মুন্সী মো. ছলিম (শীতালংশাহ) এর কিয়ামত নাম, হাসর তরান। সৈয়দ শাহনূর এর নূর নছিহত, রাগ নূর। আব্দুল হাকিম’র নছিত নামা ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

বর্তমানে নাগরী লিপিতে রচিত অনেক পুঁথি বাংলাসহ আদি নাগরী লিপিতে নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকরাও অনেক আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছেন। সিলেটি নাগরী নিয়ে অনেক গভেষণা, আলোচনা বিভিন্ন পর্যায়ের চালু আছে। ফলে আরো ব্যাপক তথ্য ও পান্ডলিপি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

সিলেটের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা:

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্বোধয়। বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা বাংলা। বাঙালির বাইরে ৪টির বেশি নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের সংখ্যা সাকল্যে ১৫ লাখ। এদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীগুলো পৃথিবীর অন্যতম চারটি ভাষা পরিবারের প্রায় ৩০টি ভাষা ব্যবহার করে। আমাদের সিলেট অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রচলিত ভাষার মধ্যে খাসিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মৈতৈ মণিপুরি অন্যতম। ২০১৩, ফেব্রুয়ারি মাসে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ‘বাংলাদেশের নানান ভাষা’ শিরোনামে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা সমূহের পরিচিতি ও অবস্থান তুলে ধরেন। ঐ অংশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, মৈতৈ মণিপুরি ও খাসিয়া ভাষার বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি:

বাংলাদেশে মূলত সিলেট বিভাগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার প্রচলন আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার দুটি উপভাষা। একটি রাজার গাঙ অর্থাৎ ‘রাজার গ্রাম’। আরেকটি ‘মাদাই গাঙ’, অর্থাৎ ‘রানির গ্রাম’। কে পি সিনহার মতে, নব্য ইন্দো-আর্য ভাষার উৎপত্তির কালে, কিংবা তার ঠিক পরেই-অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে-ইন্দো-আর্য-ভাষা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার উদ্ভব। শুরুতে এই ভাষা ভারতের মণিপুর রাজ্যে প্রচলিত হয়। এই নতুন ভাষা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গতা পায় ষোলো শতকে।

তেরো থেকে ষোলো শতক পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ও মেইতেই জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াতে মেইতেই শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। উনিশ শতকের শুরুতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার ব্যাপকভাবে ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের শব্দাবলি প্রবেশ করে। অহমিয়া ও বাংলার সঙ্গে এই ভাষার সাদৃশ্য থাকায় একে বাংলা বা অহমিয়ার উপভাষাও বলা হয়ে থাকে। তবে পন্ডিতদের অনেকেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে (১৯০৩) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন, ‘[বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি] ভাষার মধ্যে দুই ভাষার (অহমিয়া ও বাংলা) বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেও উভয়ের সঙ্গেই এর বড় ধরনের পার্থক্য আছে।’ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় এ-যাবৎ সংগৃহীত ৩০ হাজার শব্দসম্ভার রয়েছে। এর মধ্যে তৎসম শব্দ ১০ হাজার, অর্ধ তৎসম এক হাজার পাঁচ শ, তদ্ভব আট হাজার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি শব্দসংখ্যা দুই হাজার।

ভারতের আসাম ও ত্রিপুরার পাশাপাশি মিয়ানমারেও এই ভাষাভাষী মানুষ আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্রে ‘মণিপুরি অনুষ্ঠান’ নামে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মেইতেই মণিপুরি ভাষায় গান, কথিকা ও নাটিকা প্রচারিত হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার স্বীকৃতির জন্য এ ভাষাভাষী মানুষের সংগ্রাম করেছেন ভারতে। আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চ রেল অবরোধ কর্মসূচী পালন করতে গেলে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। তাতে সুদেষ্ণা সিংহ প্রাণ দেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাহিত্যভান্ডার সমৃদ্ধ। এ ভাষার কবি রনজিত সিংহের ‘বলি ইয়া আছৎ, দাদা’ কবিতার কয়েকটি লাইন ‘হারৌহান বাহিছিলে মোরে পেয়া/ আকখলাগয় তর গরে-মাংকলে-কোঠাৎ বয়া/ কতিয়ৌ সহজ করে পানা;/ কিন্তু বিধির বিধানে লেখা/ বিদা লগ্নৎ নাহে ইল দেখা/ তেব অনন্তকাল সুপৌ দুকখ নাককো পানা।’

কবি নিজেই তাঁর কবিতার তর্জমা করেছে; ‘আনন্দে বিভোর ছিলে আমাকে পেয়ে/ একা, তোমার ঘরে-উঠোনে-সাজকক্ষে/ কতই না সহজ ছিলো এ পাওয়া! / কিন্তু বিধির বিধানে লেখা/ বিদায় লগ্নে হলো না দেখা/ তবু অনন্তকাল যেন হয় না এ দুঃখ বাওয়া।’

মৈতৈ মণিপুরি:

মৈতৈ মণিপুরি ভাষাভাষীদের বসবাস মূলত বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে। ভাষা পরিবারের দিক থেকে মৈতৈ মণিপুরি তিব্বতি-বর্মী ভাষা-পরিবারের কুকি-চীন গোত্রভুক্ত। জর্জ গ্রিয়ারসন মৈতৈ ভাষাকে ভোট-চীন পরিবাভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। টি সি হাডসন তাঁর দ্য মৈতৈস বইয়ে মৈতৈ ভাষাকে তিব্বতি-বর্মী ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

মৈতৈ অতি প্রাচীন ভাষা। এ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। অধিকাংশ গবেষকের মতে, মৈতৈ লিপি ব্রাহ্মণী লিপি থেকে উদ্ভূত। ভারতের মণিপুর রাজ্যে মহারাজ পাংখংবার আমলে এ লিপির প্রথম প্রচলন হয়। তখন মৈতৈ ভাষার মোট হরফ ছিল ১৮ টি। পরে মহারাজ খাগেম্বার (১৫৯৬-১৬৫১) সময়ে আরও নয়টি হরফ যুক্ত হয়। সপ্তম শতকের একটি ব্রোঞ্জ মুদ্রার ওপর মৈতৈ লিপির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফলে মৈতৈ লিপির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। মৈতৈ লিপি প্রাচীন হলেও এ পর্যন্ত এই লিপিতে রচিত কোনো প্রাচীন গন্থের সন্ধান মেলেনি। পরে বাংলা লিপিতে মৈতৈ ভাষা লেখার প্রচলন ঘটে। বাংলা হরফে মৈতৈ ভাষায় রচিত গোড়ার দিককার দুটি গ্রন্থ হচ্ছে পুইরেইতন খুনথক ও নুমিত কাপ্পা। ত্রিপুরা রাজ্যে অবশ্য বাংলা ও মৈতৈ দুই লিপিতেই মৈথে লেখার প্রচলন আছে। মণিপুরি লিপির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতিটি হরফের নাম রাখা হয়েছে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম অনুসারে। বাংলা ‘ক’ বর্ণের মণিপুর প্রতিবর্ণ ‘কোক’। ‘কোক’ মানে ‘মাথা’। ‘স’ এর প্রতিবর্ণ ‘সম’। এর অর্থ চুল।

১৯৯২ সালে মৈতৈ মণিপুরি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বাংলাদেশ বেতার ও সিলেট কেন্দ্র ‘মণিপুরী’ নামে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে মৈতৈ ভাষায় নানা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা থেকে ‘ত্রিপুরা চে’ নামে মৈতৈ ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই মৈতৈ ভাষায় সাহিত্যচর্চা হচ্ছে। মৈতৈ ভাষার কবি খোইরোম কামিনী কুমারগী শৈরেং তার “লম্বন তোল্লবনি ঐদি বাঙলা ইমাগী মফমদা’ বা ‘ঋণী আমি বাংলা মায়ের কাছে’ কবিতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ব্যক্ত করেছেণ। কবিতার কয়েকটি লাইন এ রকম: ‘রবীন্দ্রনাথ না ঐগী থাজবা থম্মোয়গী ঙমকৈনি/ নজরুল ঐগী নুংশিবা-লালহৌনি/ জীবনানন্দনা ঐগী লৈপাকনিঙবা/দ্বিজেন্দলাল, অতুলপ্রসাদনা ঐগী খোন্থোক্কী ঈশৈ;/লম্বন তোল্লবনি ঐদি/বাংলা অমসুং বাংলা ইমাগী মফমদা।’ কবির স্বকৃত অনুবাদে; ‘রবীন্দ্রনাথ আমার প্রত্যয়–হৃদয়ের সীমানা/নজরুল আমার প্রেম–বিদ্রোহ/জীবনানন্দ আমার দেশপ্রেম, /দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ আমার কন্ঠের গান। ঋণী আমি বাংলা ও বাংলা মায়ের কাছে’।

খাসি:

বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসরত মঙ্গেলয়েড খাসিয়া বা খাসি জাতির ভাষার নাম খাসি ভাষা। এই ভাষার স্থানীয় নাম খাসিয়া। খাসিয়া নৃগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড হলেও খাসি ভাষা অস্ট্রিক মোন-খমের গোত্রের অন্তর্গত। বাংলাদেশে বর্তমানে খাসিয়াদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে এ সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২৮০। ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ লোক খাসি ভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী খাসি ভাষার সঙ্গে মিয়ানমারের মোঁয়ে, পলং এবং উপমাহাদেশের তালাং, খেড়, সুক, আনাম, খামেন, চোয়েম, ক্ষং, লেমেত, ওয়া প্রবৃতি নৃগোষ্ঠীর ভাষার মিল লক্ষ করেছেন। খাসি ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি নেই। ১৮১২ সালে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রথম বাংলা বর্ণমালায় খাসি ভাষায় নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেন। ১৮৩৮ সালের পরে ওয়েলস মিশনারি দলের টমাস জোনস রোমান হরফে খাসি ভাষা লেখার প্রচলন করেন। বর্তমানে খাসি ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়। বাংলাদেশের খাসিয়াদের মধ্যে অনেকে এখন বাংলা লিপিতেও খাসি ভাষা লিখছেন। খাসি ভাষার উপভাষা রয়েছে বেশ কয়েকটি। লিঙ্গামকে এই ভাষার ঔপভাষিক বৈচিত্র্য বলে মনে করা হয়।

খাসি ভাষায় খুব বেশি সাহিত্য রচিত হয়নি। চাকমা বা মণিপুরিদের সঙ্গে তুলনা করলে একে অপ্রতুল বলা চলে। খাসি ভাষার কবি রুশ পতামের একটি কবিতার নাম ‘জিং ইম হা লুম’ বা ‘অরণ্যে স্নিগ্ধ জীবন’। দীর্ঘ এই কবিতায় খাসিয়াদের রোজকার জীবনের একটি ছবি পাওয়া। একই সঙ্গে পাওয়া যায় গভীর দেশাত্মবোধ। কবিতাটির এক জায়গায় আছে, ‘ডাং স্টে ফেরঙাপ কি ফেট শা ব্রী/ কি সং উ কোয়াই কা ওয়াইট টারী/ উ ছট কি কিয়াং লেনটি বা জেঙাই/ কি স্টেট কি ইয়াইড বান ওয়ান ডিংশাই। হা ট্রেপ সংথাইট টেমপেউ তাহ শুন/ জ্বাপ জ্বাপ বাম কোয়াই কাম বা বুন। .../ কো রি বা ইজ খুবলেই ইয়াফা/ কুমনো ঙান ক্লেট জিংবাং জংফা/ রীথর রীলুম লং কিসিয়ার রুপা/ ডিংসীজ কেনবাট বাডাপ পুড়া।’ অর্থাৎ ‘ভোরে জেগে উঠে চলি পান ক্ষেতে/ পানসু-পারি, দা-টারি সাথে/ কাঁধে ছট খাড়া অতি দ্রুত যেতে হবে দূরে/ ফিতে হবে আধার নামার আগে/ ক্ষেত আর কুঁড়েঘর আনন্দ-আয়েশ/ তাড়া করি কাজ পান-সুপারি চিবিয়ে। .../ প্রিয় জন্মভূমি, তোমার আশীর্বাদ/ প্রতিদিন স্মরণে তোমার সুমিষ্ট দান/ সমভূমি পাহাড় অরণ্য সোনারূপার দেশ/ গাছ বাঁশ ঘাস লতাগুল্ম গুচ্ছ সমাহার।’

সিলেটিগণ তাদের নিজস্ব উপভাষা ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত এবং যেকোন পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় ভাব বিনিময় করতে ভালবাসেন। সিলেটিরা শিক্ষা দীক্ষায় সম্পদে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন।

সহায়ক:
* উপভাষা চর্চার ভূমিকা - মনিরুজ্জামান
* ফোকালোর চর্চায় সিলেট - নন্দলাল শর্মা
* সিলেটি নাগরী পরিক্রমা - চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্য ভূষণ
* ইউকোপিডিয়া
* ইন্টারনেট (গুগল)
* দৈনিক প্রথম আলো
* বিভিন্ন স্থানীয় স্মরণিকা

বালাগঞ্জ প্রতিদিন
balaganjprotidin.com

এপ্রিল ২০২৫ইং
বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরী

গল্প

ঋতুর শেষে

সপ্তদ্বীপা অধিকারী

কাঠফাটা গরমে একজন মানুষও যখন বাইরে বের হচ্ছে না তখনই মনামি ওকে দেখেছিল। তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। বিকেল আর সন্ধ্যের সন্ধিক্ষণ তখন। ঠিক সেই সময় মনামি ওকে দেখল। পার্কের পাশেই সেই বড়ো পুকুরটার গা-ঘেঁষা রাস্তায় তখন বেশ কয়েকজন মানুষ হাঁটছে বা বেড়াচ্ছে। লোড শেডিং না হলে এই গরমে কেউই বাইরে বেরুতো না। মনামিও সেই জন্যই বেরিয়েছে। পুকুরের পাশেই ছিল কয়েকটা বেঞ্চ। কেউ কেউ বসে আছে। সেই রকমই একটা বেঞ্চে ও বসে আছে! মনামি আগে-পিছে চিন্তা করার সময় পেল না আর। আজই সে বলবে। সিদ্ধান্ত নিয়েই সে এদিক-ওদিক চাইল। কেউ নেই আশেপাশে। মনামি মাথাটা নিচু করে বলল–'সাকিব শুনছ? একটা কথা বলতে চাই! বসব তোমার পাশে?'

'কেন মা? আমার পাশে বসবে কেন গা?'

জবাব শুনে চমকে উঠে মনামি দেখল সেখানে সাকিব নেই! একজন থুথুরে বৃদ্ধা ভিখারি বসে!

মনামি পালিয়ে বাঁচল! সে এত্তো বড়ো ভুল কেমন করে যে দেখল, ভগবান জানেন!

গরমটা আরো বেশি করে মনামিকে পোড়াতে লাগল।

যন্ত্রণার শেষে এক ঘন বর্ষামুখর দিনে মনামি নিজেকে এক বাসস্ট্যাণ্ডে আবিষ্কার করল। গোটা কয়েক মানুষ বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে। কেউ বর্ষাতি গায়ে। কেউ ছাতা মাথায়। বৃষ্টির জল তার বেগের তাড়নায় চতুর্দিক ধোঁয়া ধোঁয়া করে তুলেছে! মনামি দেখল দুজনের বসার সিটে সাকিব বসে আছে। পাশের সিটটা খালি। মনামির ভীষণ ইচ্ছে করছে সাকিবের পাশের সিটটায় বসতে।

সে জানে বর্তমানে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি তাতে করে তাকে সাকিবের পাশে দেখলেই জগৎ সংসার হায় হায় গেল গেল করে উঠবে! তাতে অবশ্যই মনামির তেমন কিছু যাবে আসবে না! কিন্তু যদি সাকিব তাকে অস্বীকার করে? ওরে বাবা! ভাবতেই মনামির বুক ঢিপ ঢিপ!

একবার সে ভাবল যে সে ফিরে যাবে!

কিন্তু সাকিবকে না বলে ফেরার কথা যে সে কল্পনাও করতে পারে না! চারিদিকের লোকজনের কান বাঁচিয়ে মনামি বলল–"তামার সাথে একটা জরুরি কথা আছে। তোমার পাশে একটু বসব, সাকিব?"

উত্তরের অপেক্ষা করে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে মনামি সাকিবের পাশটিতে বসবার জন্য সবে নিচু হয়েছে...! ঠিক তক্ষুনি হিশশশশ...!

আওয়াজ শুনেই মনামি চেয়ে দেখল সেই সিটের উপর এক হাত ফণা তুলে একটা বিষাক্ত কেউটে! ফণাটা অল্প অল্প দুলছে! মনামি নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল– বাঁচাও...! বাঁচাও...!

এবং মনামি এই প্রথম খেয়াল করে দেখল বাসস্ট্যান্ডে সে আর ওই চক্রধারী ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই! তবে কি ও ভুল দেখছে বারবার? কে জানে রে বাবা! মনামি মনে মনে ভাবছে!

পুরো বর্ষাকালটাই সে আর বাইরে বের হয়নি।

এবার শরৎকালে মনামিরা সবাই মিলে বেড়াতে গেল। বহুদিন মামার বাড়ি যায়নি তারা। পুজোর অষ্টমীর দিন ঘুরতে ঘুরতে মনামিরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে নির্জন কাশবনের দিকে চলে যায়। সবারই বেশ ভালো লাগছিল। কী সুন্দর দুলে দুলে উঠছে ধবধবে কাশবন। মনামিরা প্রথমেই পিছনে কাশবন রেখে ক্লিক ক্লিক ছবি তুলল কয়েকটা। তারপর মনামির হঠাৎ মনে হলো সে একা একটা ছবি তুলবে। সেটা সে সাকিবকে দেখাবে। কোনোদিন না কোনোদিন তারা কাছে তো আসবেই। সে একশতভাগ নিশ্চিত! ভেবে সে সেলফি তুলতে যেতেই দেখল মোবাইলের স্ক্রীনে তার পিছনে কাশবনের এক্কেবারে ভিতরে সাকিব বসে আছে। চমকে উঠল মনামি। ফোন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে পিছন ফিরতেই দেখল কাশবনের ভিতরে সত্যি সত্যি সাকিব বসে আছে! অল্প অল্প হাসছে সাকিব। মনামির চোখে জল চলে এল। অবশেষে সে সাকিবকে পেয়েছে এই সহজ-সরল গ্রামের ভিতর। এখানে সে নিঃসংকোচে মনের আগল খুলতে পারবে। এক পা বাড়িয়েই সে থেমে গেল। বান্ধবীরা রয়েছে যে! তারা জানলেই পুরো এলাকা রাষ্ট্র হয়ে যাবে! তারপর? ওরে বাবা! তারপরের কথা তো সে চিন্তাতেই আনতে পারে না। নির্ঘাত সাকিবের মা-বাবা নিজে থেকে তাকে খুন করবে। অথবা তার বাবা-মাও পারে সাকিবকে একেবারে শেষ করে দিতে! সব সে বোঝে! তবুও নিজেকে সে সংযত করতে পারে না! সাকিবের কথা ভাবতেও তার ভাল্লাগে! সে কী করবে? যদি সাকিবও তাকে ভালোবাসে তাহলে ওর হাত ধরে ও পালিয়ে যাবে! আর যদি সাকিব একটুও ভালো না বাসে তাহলে? তাহলে আর কী? সরে যাবে দূর থেকে আরো দূরে! দূরে যাওয়া তো যায়ই। তবে তার আগে তাকে সাকিবকে নিজের মুখে ভালোবাসার বর্তাটা পৌঁছে দিতেই হবে! যে কোনো মূল্যে! তাকে বলতেই হবে। চুপি চুপি! যেন কেউ না জানতে পারে!

মনামি কাশবনের ভিতরে ঢুকে একবার পিছনে তাকালো। বান্ধবীরা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে! লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে যেতেও কাত হয়ে সে বলল–'তোমার পাশে একটু বসি সাকিব...! কিছু বলতে চাই!'

দমকা হাওয়ার বেগে কেউ যেন ওকে বেদম ধাক্কা মারল!

চমকে উঠে মনামি দেখল একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় তারই দিকে তেড়ে আসছে! ওরে বাবা! ষাঁড় এলো কোথা থেকে!

এক লাফে কাশবন ছেড়ে মনামি রাস্তায়। তারপর ছুট ছুট ছুট! ছুটতে ছুটতে সে আরো একবার পিছন ফিরে চাইল! ধবধবে কাশবন দুলছে হাওয়ায়! যেন সে খুব খুশি।

কোথায় ষাঁড়! কোথায় বা সাকিব!

পাশে তাকালো। ডাইনে, বাঁয়ে। তার বান্ধবীরাও নেই!

সে একদম একা একা কার যেন তাড়া খেয়ে ছুটছে! সামনে আর সে তাকালো না। ছুটলও না। ধীরে-সুস্থে মামার বাড়ি ফিরল সে। গভীরভাবে মনামি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছিল। ওর সাথে বারবার এমন কেন যে হচ্ছে!

মা-বাবা ফিরে গেলেও মনামি রয়েই গেল।

ওই কাশবন তাকে যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকে। সাকিব আছে। এইখানেই। সে তাই আর ফিরল না।

মামাতো বোনের সাথে দিনগুলো কেটে যায়। সবই স্বাভাবিক। শুধু মাঝে মাঝে সাকিবকে কথাটা বলার জন্য ছটফট করে মনামি! কেন যে সে এমন গভীরভাবে ভালোবাসল সাকিবকে! সাকিব ভালোবাসলে সে জগৎ-সংসার, ইহকাল-পরকালকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করবে না!

তখন মাঠে ধান কাটা হচ্ছে। মামাতো বোন রিম্পার সাথে ফিরছিল মনামি। মাটির রাস্তা। দুই পাশে পাকা ধানের গাছ! সারি সারি সোনালি রঙের লক্ষ্মী ঠাকুরের দানা! কোনো কোনো মাঠে ধান গাছ কাটা হয়ে গেছে। কোথাও সোনার ফসল ভারী হয়ে গর্ভবতী স্ত্রীর মতো গর্বিত ভঙ্গিতে শোভা পাচ্ছে। মনামি আর তার মামাতো বোন রিম্পা নিজেদের মতোই হাঁটছিল। ঠিক সেই সময় মনামির চোখে পড়ল। মাথায় গামছার বিড়ে বেঁধে একটা ধানিজমির আলে উদাস ভঙ্গিতে বসে আছে সাকিব! মনামি দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বিশ্বাস ছিল যে এখানে, তার মামাবাড়ির সহজ, সরল এই গ্রাম্য এলাকায় সাকিব তাকে ধরা দেবে। দেবেই। সে জানত! সে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল। দেখল সাকিব উদাস হয়ে চেয়ে রয়েছে দূরে কোথাও! মনামি পায়ে চলা মাটির পথ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ল।

রিম্পা বলল–'এ দি, কোথায় যাচ্ছিস?'

মনামি জবাব দিল না কিন্তু পিছন ফিরে বোনের দিকে চেয়ে বলল–'একটু দাঁড়া। এক্ষুণি আসছি!'

রিম্পা বলল–'কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস তুই? এই রাতের বেলায় কবরস্থানের দিকে যাবার মানে কিরে দি?'

মনামি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্তের শতভাগের এক ভাগের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, সেখানে সাকিব নেই! সত্যিই নেই! বরং মুসলিমদের বিশাল কবরখানার সামনে সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে। একদম একা। কোথাও কোনো মানুষজন নেই! ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মনামি। এইমাত্র সে রিম্পার সাথে কথা বলেছে। এইমাত্র দিন ছিল। এইমাত্র এইখানে সাকিব ছিল। সে রিম্পার দিকে চাইতেই সব ডুবে গেল? সব? সে বাড়ির দিকে চেয়ে দেখল বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূর! অন্ধকারে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মনামি। রিম্পা নেই কেন? রাতই বা কেমন করে হলো? এসব কী হচ্ছে তার সাথে?

মাঠ ছেড়ে সে পায়ে চলা মাটির রাস্তায় উঠতেই আবার দেখতে পেল একদম সামনেই সাকিব! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনামি! সাকিব তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তাকে দেখেই মনামির ভয় কেটে যাচ্ছে একটু একটু করে! এখন সে সাকিবকে বলবেই সেই কথাটা! আশেপাশে কেউ নেই! তাই সাকিব তাকে গ্রহণ না করলেও তার লজ্জার কিচ্ছু নেই! শুধু ভয় রিম্পাকে। রিম্পা তার সাথেই ছিল। কোথায় গেল সে? তবে কি লুকিয়ে লুকিয়ে তার উপর নজর রাখছে? নিশ্চয় তাই।

ঠিক এই সময় তার দিকে এগিয়ে আসা ছেলেটা তার মুখের দিকে একবার চাইল। তারপর নিজের মোবাইল বার করে কাউকে ফোন করে বলল–'সোমককাকু পেয়েছি মনামিকে!'

সোমক। মনামির মামার নাম।

মনামি অবাক হয়ে দেখল তার সামনে মৃন্ময়। মামাবাড়ির পাশেই বাড়ি। ছেলেটা ভেরি রিসেন্ট সরকারি চাকরি পেয়েছে। পরোপকারী এবং ভদ্র ছেলেটাই বা এখানে কেমন করে এল ভাবতে ভাবতে মনামি মৃন্ময়ের সাথেই পথ হাঁটছিল।

পরের কয়েকদিন মনামি নিজের ভিতরেই পড়ে ছিল। তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার থই খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিল যখন, ঠিক তখনই মামার সাথে মনামির বাবা-মায়ের কথা হয়। অবশ্য মৃন্ময় যদি মনামিকে তার ভালোলাগা এবং ভালোবাসার কথা সকলকে না বলত, তাহলে মনামির বাবা-মা এই গ্রামে তার বিয়ে ঠিক করত কী না তা অবশ্যই ভাববার বিষয়! তা সে মৃন্ময় যতই সরকারি চাকরি করুক না কেন!

মনামি যখন শুনল তখন তারও ভিতরে ভিতরে হুড়মুড় করে সমস্ত স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটল। সে তো পাগলের মতো সাকিবকে খুঁজে চলেছে। কই সাকিবের তরফ থেকে তো কখনো তার সাথে দেখা করার সামান্যতমও আগ্রহ প্রকাশ পায়নি! তবে কি সে একাই ভালোবাসে সাকিবকে?

হ্যাঁ তাই। একদম তাই! এতদিনে মনামি নিজেকে বুঝতে পারল। সে সাকিবের থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। আর নয়। অনেক হয়েছে। তাছাড়া সে তার সমস্ত কথা রিম্পাকে বলেছে। রিম্পার কাছ থেকে মামা-মামি এবং পরে তার মা-বাবা সব জেনেছে। তারপরই বিয়ের সিদ্ধান্ত। মামার বাড়িতে থেকেই বিয়ে সম্পন্ন হলো মনামির। মৃন্ময় বেশ ভালো ছেলে। মিষ্টি স্বভাবের। বউভাতের দিন মনামি মৃন্ময়কে সমস্ত কথাই বলল। সমস্ত। সে এই কথাও বলল যে, তার এই সমস্ত ঘটনার এক বিন্দু বিসর্গও সে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে না।

মৃন্ময় ভালো বন্ধুর মতো সব শুনল খালি।

শুনে বলল–'তোমাকে আমার সাথে বিয়ে দেবার জন্যই তোমার মা-বাবা তোমাকে এখানে রেখে গেছেন।'

এবার অবাক হয়ে মনামি বলে উঠল–'মানে?'

মৃন্ময় বলে–'আসলে তুমি মনে হয় কোনো ছেলেকে ভালোবাসো। কিন্তু কাকে তা অনেক অনুসন্ধান, অনুসরণ করেও ধরতে পারেন নি তোমার বাবা-মা! তোমার আচরণে অনেক অসঙ্গতি এসে গেছিল। সেই সময় আমি তোমার প্রেমে পড়ি এবং সোমককাকু মানে তোমার মামাকে বলি।'

মনামি বলে–'তারপর?'

মৃন্ময় হাসতে হাসতে বলে–'তারপর আবার কী? তারপর তো এই এখন তুমি আমার বউ! মিসেস মৃন্ময়!'

মনামিও হেসে ফেলল।

বলল–'পুরো পরিবারসুদ্ধ পরিকল্পনা করলে আমি কিচ্ছু বুঝতেই পারলাম না!'

মৃন্ময় বলল–'না। বিষয়টা তেমন নয় গো! তোমার আচরণে অসঙ্গতি দেখে ওঁরা সন্দেহ করেছেন এ কথা যেমন ঠিক, সেই সাথে ওঁরা ভয়ও পেয়েছেন যে, তুমি আবার কোনো মুসলমানের প্রেমে না পড়ে যাও!'

মনামি বলে–'ও, তার মানে আমার মা-বাবার সাথে এই সমস্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে!'

মৃন্ময় বলে–'তুমি মা হলেও এটাই করবে!'

মনামি বলে–'আজ্ঞে না। হিন্দুও যেমন খারাপও হয়, ভালোও হয়। মুসলমানও তেমন! বিয়ে সেখানেই করা উচিত, যেখানে প্রেম আছে। ভালোবাসা আছে!'

বলতে বলতে মনামির চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

মনে মনে বলল সে–'শুধু আমি তোমার সাথে কথা বলার সুযোগটুকু পেলাম না প্রিয়! জানতেও পারলাম না তোমার অভিমত! নইলে...!'

সাতদিন পর মনামি মৃন্ময়কে নিয়ে অষ্টমঙ্গলায় বাপের বাড়ি আসছিল।

তখন বসন্ত এসে গেছে। তখন কোকিল ডাকে। তখন বাতাস উৎফুল্ল থাকে। তখন আকাশে প্রেম ঘোরে! তখন রাতে রাতও কথা কয়।

সেই মনামি নামক মেয়েটার কপালে সিঁদুর, পরনে নতুন শাড়িতে আর গয়নাতে তাকে অনন্যসাধারণ লাগছে। সেও খুব সুখী মনে করছিল তখন নিজেকে। সাকিবকে সেই রাতের পর থেকে সে বিদায় জানিয়েছে।

আকাশে-বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া। উসকানিমূলক বাতাস। থেকে থেকে কোকিলের ডাক। মনামিকে চঞ্চল করে তুলছিল। ঠিক সেই সময়! একদম হঠাৎ বাড়ির কাছাকাছি এসে সেই পার্কের পাশ দিয়ে যখন তাদের অটো যাচ্ছিল, ও দেখতে পেল সাকিবকে! আবার! সেই একই পার্কের পাশের বেঞ্চিতে বসে আছে! সে মৃন্ময়ের দিকে চাইল।

বলল–'আচ্ছা, তুমি কি ওই বেঞ্চটায় একজন সুপুরুষকে বসে থাকতে দেখছ? গায়ে তার সাদা জামা!'

মৃন্ময় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

মনামি অবাক হয়ে বলল–

'দেখতে পাচ্ছো? সত্যি?'

মৃন্ময় মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, সে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তাতে কী?

মনামি বলল–'ওই তো আমার সাকিব!'

মৃন্ময়ের কানে খট করে বাজল। 'আমার' শব্দটা!

মনামি বলল–'একবার দেখা করে আসি?'

মৃন্ময় আবারও ঘাড় নাড়ল।

সে মনামিকে যাবার অনুমতি দিলো!

মনামি অটো দাঁড় করিয়ে ছুটল। পিছন পিছন মৃন্ময়ও আসতে লাগল। মনামি ভাবছে আজ আর তার কোনো দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই! আজ সে বিবাহিত! সাকিবকে ভালোবাসার কথাটা সে অস্বীকার করবে! বলবে না। আজ আর বলে কী হবে? এখন হিন্দু হয়ে মুসলিম বা মুসলিম হয়ে হিন্দুকে ভালোবাসার কথা উচ্চারিত হলেই বাংলাদেশে আব্দার নেমে আসে। অস্ত্র সেজে ওঠে। তাছাড়া সে তো মৃন্ময়কে বিয়ে করেছে! আর কেন? সে বরং বলবে–'আমি তোমাকে খুঁজছিলাম! আমি আমার স্বামীকে খুব ভালোবাসি। এই কথাটা বলার জন্যই খুঁজছিলাম!'

সে এখন ঠিকই বুঝতে পারে যে, দুই হাজার চব্বিশ সালের অক্টোবর মাসের বাংলাদেশে মানিয়ে নিয়ে চলার দায় প্রতিটি মানুষকেই নিতে হবে! তার হয়ে অন্য কেউ মানিয়ে নেবে না!

মনামি পার্কে ঢুকেই সোজা চলে গেল সাকিবের কাছে। আজ আর কোনো দ্বিধা–দ্বন্দ্ব নেই! সাকিবের পাশে বসার অনুমতিও চাইল না আজ। সিদ্ধান্ত এভাবেই জীবনে বসন্ত নিয়ে আসে। স্থির সিদ্ধান্ত এভাবেই স্বপ্নকে সফল করে তোলে। সে তার ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৭, কলাম ৪

ইসরাত জাহান

শুকনো জায়গা পেলে শোকগুলো কবর দেবেন

শক্ত খড়খড়ে এঁটেল মাটি, কিছুদূরে এই খড়খড়ে মাটিতে ঝোপের মতো গুটিশুটি হয়ে বসে আছে হাতিশুঁড় গাছ, বিভ্রম, দূর থেকে সবুজবীথি ভেবে ছুটে আসে, অদূরে সবুজ বনের হাতছানি, যেন ডাকছে, তৃষ্ণায় কাতর মেয়েটা ছুটতে থাকে, ছুটতে থাকে, পায়ে ও শাড়িতে সন্ধি হয়ে তাল-বেতালে আছড়ে পড়ে শক্ত ভূমিতলে, যেখানে শুয়ে আছে কিছু পাথর...

সেঁজুতি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে।

পৌনে দশটার মতো বাজে, সূর্যের আলো পর্দা এড়িয়ে তেরছাভাবে গড়িয়ে পড়েছে বিছানার চাদরে, সেঁজুতির গায়ে জড়ানো কাঁথায়। হালকা মেঘের বাহানায় আজ রোদের আধিক্য একটু কম, অবশ্য বছরের এই সময়টায় অমনই থাকে। হঠাৎ মেঘ এসে জমে ঈশান কোণে, তারপরে ঝরে নিজের মতো কিছু সময়। সূর্যটা লাজুক কিশোরীর মতো মুখ লুকায়। পরক্ষণেই সূর্যের আলো মেঘের ফাঁক গলে ফুরফুরিয়ে বেরিয়ে আসে মাটির ঘাসে। তখন সোনালি আভা ঝলমলিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, একটু আগে হুট করে আসা বৃষ্টির কল্যাণে চারপাশটা এখন এমনই, যদিও রাস্তাটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে তবে বাতাসটা বেশ ঝরঝরে। সূর্যের আলোটাকে এড়াতে পর্দাটা টেনে আবারও বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। আজ ওর অফিসে যাবার তাড়া নেই। নিজের ব্যবসা হওয়ায়, সময়ের কাঁটা মেপে যেতে হয় না, ওদিকে চারপাশের পরিস্থিতি এখন অস্থির। গতকাল সারাদিন জ্যামে কেটেছে অনেকটা সময়। এখন সবকিছু স্বাভাবিকতা হারাচ্ছে, রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ জ্যাম বেড়ে যাচ্ছে, এমুখ ওমুখ হবার উপায় থাকে না সে বেলাগুলোতে। এইতো দুইদিন আগে ছাত্ররা রাস্তা নামল। সরকারি চাকরিতে কোটার সংস্কার চায় ছেলেপেলেরা। চাকরিতে কোটার শতকরা হিসেবের গড়মিলের কারণে সাধারণ ছাত্ররা পিছিয়ে পড়ছে চাকরির বাজারে। আগেও করেছে, এখনো করছে, সেঁজুতি বরাবরই এইসব আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকে, পেপার উলটে যা জানে তাই ওর সই। ওর কাছেপিঠের প্রায় সবাই দেশের বাহিরে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। একমাত্র ছেলে টোটোন। চিরকাল প্রাইভেট স্কুল ও কলেজে পড়েছে ওর ছেলে। সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়নি। তাছাড়া সরকারি চাকরি নিয়ে দৌড়াদৌড়িও করবে না। সেঁজুতিও সেটা চায় না। সেঁজুতির ছেলেটা মায়ের কোলে শুয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি, সেই দশ বছর বয়স থেকে বাবার সাথে থাকে। বিচ্ছেদ। ছেলে হবার সুবাদে টোটোনের কাস্টোডিয়ান ওর বাবা পেয়ে যায়। সেই থেকে মা ও ছেলের তেমন একটা দেখা হয় না। ওর কাছে তেমন আসতে চায় না। উৎসবের দিনগুলোতে আগে আসলেও এখন বন্ধুদের সাথে কাটাতে বেশি পছন্দ করে টোটোন। মা অপেক্ষা করে ছেলের মুখটা দেখার জন্য। ছেলে মাকে এড়িয়ে চলে। হয়তো মাকে দোষী মনে করে। সেঁজুতি জানে, টোটোনের অনেক অভিযোগ। প্রায় সময় বলে, কেন ওর মা একটু কষ্ট করে ওর বদরাগী বাবার সাথে মানিয়ে নিতে পারল না। যদি মানিয়ে নিতাম, তাহলে ওকে এতটা কষ্ট করতে হতো না। সেটা সেঁজুতিও জানে। আরো একটু মানিয়ে নিলে ছেলেটার কাছ থেকে এত দূরে দূরে থাকতে হতো না। প্রতিবেলায় রেঁধে নিজের হাতে ছেলেকে খাওয়াতে পারত। দূরত্বের ব্যাপ্তি প্রায় বারো বছর হয়ে গেল। টোটোন এখন বাইশ। আর দুইবছর অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে টোটোন চলে যাবে কানাডায়। ওখানে পড়বে, ঘুরবে, চাকরি করবে। সেঁজুতিও একটু একটু করে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। চলে যাবে ছেলের সাথে। সবকিছু মা ও ছেলে গোপনে ঠিক করেছে। ছেলের বাবার আড়ালে। মনে মনে এখনই সুখভাবনায় বিভোর সেঁজুতি। আর তো মাত্র কয়টা দিন। মা ও ছেলে একসাথে থাকবে বিদেশের মাটিতে। তখন ছেলের বদরাগী বাবা মা-ছেলের সুখ দেখে আঙুল কামড়াবে। চিরকাল লোকটা ছেলেকে নিজের কাছে রেখে আরো কষ্ট দিত সেঁজুতিকে। সেঁজুতি প্রতিবাদ করত। কেঁদে একাকার হতো। কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচে আটকে যেত। এবার সেই বিচ্ছেদের সব কষ্ট সুদসহ ফিরিয়ে দেবে সেঁজুতি। ভবিষ্যতের সুখ ভাবনায় সেঁজুতির চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। সেঁজুতি চোখটা মুছে বিছানা ছাড়ে। তখনই টোটোনের ফোনটা আসে।

মা, জানো...

কানে পেনসিল গুঁজে, কপাল কুঁচকে নিবিষ্টমনে পত্রিকার পাতার এফোঁড়ওফোঁড় করছে সাজিদ। বুধবারের মধ্যে এডিটিং শেষ না করতে পারলে, সামনের মাসে পত্রিকা পাওয়া যাবে না। সাজিদ 'মায়াকান্না' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। এবারে সাজিদ অনেকটা নিজ আগ্রহে একটি 'বর্ষা সংখ্যা' করার উদ্যাগ নিয়েছে। সাথে সম্পাদকের মৌন সম্মতি। তাই তো এতটা নিবিষ্ট। আগস্টের ভেতরে যদি 'তরুণ কবি সংখ্যাটা' বের না করতে পারে, তাহলে ইজ্জতের বদখৎ হয়ে যাবে। কিছুটা বেখেয়ালি সাজিদকে ওর বন্ধুরা বলেছিল, ভাতের চাল না কুটে পোলাওয়ের চাল কুটতে বসলি কেন? আসল কাজ ফেলে মিছিমিছি এসবে করতে যাওয়াটা বোকামি। কেননা আজকাল লোকজন সাহিত্য পত্রিকা পড়ে না। সপ্তাহে একদিন পত্রিকার একপাতা জুড়ে কবিতা বের হয়। তাই তো লোকজন পড়ে না। কেন পড়ে না! সেটাই বিশাল প্রশ্নবোধক। সাজিদ সবকথা কানের পাশ থেকে সরিয়ে বর্ষা সংখ্যা গোছানোর কাজে মন দেয়। কিন্তু সাজিদ কোনোভাবে স্থির হয়ে বসতে পারে। আজ অফিস আসার সময় থেকে মনটা বেশ অস্থির। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সেনাবাহিনী সদস্যরা দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্ররা রাতদিন এক করে গলা ফাটিয়ে আন্দোলন করছে। চারপাশের অশান্ত ঢেউটা সাজিদের মনোজগতে বাড়তি চাপের সৃষ্টি করছে। কখন কী হয়! বাসা থেকে বের হবার সময় মৌলির মুখটা শুকনো ছিল। এডভান্স স্টেজে আছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বেশ নাজুক। হঠাৎ যদি মৌলিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হয়! কীভাবে ছুটবে? আজ কীভাবে বাসায় ফিরবে? সবকিছু মিলিয়ে সাজিদের কেমন যেন অসহায় লাগে। ওঠে দাঁড়ায়।

লম্বা টানা বারান্দার ধার দিয়ে এগোলে তিনটি রুম, তার মধ্যেই একটিতে ডিটিপির কাজ চলে। সকালেই কাজ শুরু হয়েছে। কাজের মধ্যেই মাঝেমাঝে উঠে সাজিদ বাহির বের হয়ে, চা-সিগারেটের জন্যে। একনাগাড়ে কতক্ষণই আর প্রুফ দেখা যায়, কতক্ষণই বা শানিয়ে রাখা যায় চোখটাকে। অনেকটা সময় ধরে চোখটা সাজিদকে বিরতি নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।

সারাদিন জোরকদমে কাজ করার পর সাজিদ দেখে, যতটা কাজ গোছানোর কথা ছিল, তার চেয়েও বেশি কাজ হয়ে গেছে। অশান্ত মনটাকে শান্ত করার আশায় বাইরে টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়, সন্ধ্যা নামছে। চারপাশের বাড়িগুলো আজ কেমন যেন গুমোট হয়ে আছে। আশপাশ থেকে একটু পরপর এ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন ভেসে আসছে। দূর থেকে ভেসে আসছে আজানের সুর, 'আল্লাহ আকবর'। রোজকার ঘিঞ্জি এলাকাটায় আজ লোকজনের উপস্থিত তুলনামূলক কম। আকাশটা বাদল মেঘে কালো হয়ে আসছে। সাজিদ রাস্তায় নেমে আসে। অফিসে নিচে টংয়ের দোকনটা গুটিয়ে রাখা হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত আসর গুছিয়ে বসে ছিল আব্বাস। সাজিদ কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে যায় গন্তব্যহীনভাবে।

সকালে ছেলের ফোনটা আসার পর থেকে সেঁজুতির বুকটা ভার হয়ে আছে। চারপাশে কী হচ্ছে এসব! এই ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো কীসের নেশায় ছুটে যাচ্ছে এত উদ্ভ্রান্তের মতো সবকিছু ছেড়ে। ওরা তো বোঝে না, ওদের জীবন কতখানি মূল্যবান ওদের আপনজনের কাছে। সন্ধ্যার আগে টিভির সামনে বসে সেঁজুতি আরো অস্থির হয়ে ওঠে। নেটওয়ার্কে সমস্যা। ছেলেকে ফোনে পাচ্ছে না। ছেলের বাবাকে ফোন করতে গিয়ে আঙুল স্থির হয়ে যায়। কী বলবে ওই বদরাগী লোকটাকে। নিজের সাথে অনেকটা বোঝাপড়া করে ফোন করে সেঁজুতি।

আশপাশ থেকে অনেক লোক ছুটে আসছে হাসপাতালে, কেউ রক্ত দানের জন্য, কেউ বা রক্ত গ্রহণের আশায়। সাজিদকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে, ওর বন্ধুরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সাজিদকে বাঁচিয়ে রাখার। সাজিদের শীত ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৭, কলাম ৪

ডাকনামে ডেকো আমায়
সেখ আফসানা পারভিন

যদি কোনোদিন ফিরে আস আবার,
ডাকনামে ডেকো আমায়;
যদি কোনোদিন মনে পড়ে যায় হঠাৎ অবেলায়,
ডাকনামে ডেকো আমায়;
জ্যোৎস্না রাতে যে গলির মোড়ে আমায় তুমি আতর
উপহার দিয়েছিলে,
সেখানে এসে ডেকো আমায়।
বুকের ভিতর শূন্য হলে একলা হলে অন্ধকারে
ঠিক যেভাবে পাশে ছিলে,
তেমনই করেই ডেকো আমায়।
আজও আমি আতর মাখি, শরীরে ঢেলে নিই আতরের শেষ বিন্দু,
সুগন্ধ ছড়ায় নীল জ্যোৎস্নায়, কই তুমি ডাকো না তো?

যদি পরজন্মে দেখা হয়ে যায় কোনোখানে কোনো সময়,
ডাকনামে ডেকো আমায়;

ক্রন্দন গুচ্ছ
কবীর হোসেন

আমি কী অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি
আমার সব উদাহরণ এঁকেবেঁকে যাচ্ছে কেন
আমার কেন গণিকাকেই মনে হচ্ছে প্রকৃত প্রেমিকা।

ঘুম থেকে ওঠার পর কী হলো আমার
কেন বেশিরভাগ মানুষকেই মনে হচ্ছে ইতর।
বাসে উঠে মিরপুর যেতে যেতে
সব স্টেশনকেই মনে হচ্ছে মিরপুর ১০।

কেন মনে হচ্ছে নরকে নারী আর নারীকেই নর
মনে হচ্ছে মানুষও উভচর।

আমার কী হয়েছে যে সকল হাসিকেই মনে হচ্ছে ক্রন্দন।
আমি কীভাবে বই না পড়েই নিখুঁত পড়ছি মানুষের মুখ।
শ্রবণ শক্তি ছাড়াই শুনতে পাচ্ছি চিৎকার।

আমার অত শক্তি না থাকলেও
আমি কীভাবে গুড়িয়ে দিচ্ছি বড় বড় প্রাসাদ
আমি কীভাবে নদীর ঢেউ তরঙ্গ তুলে
ভেসে যাচ্ছি নগর মধ্যিখানে।

জানি আমি অসুস্থ ভীষণ
তবু আমি কীভাবে ভালোবাসছি ময়ুরী পেখম
নাচ গান মিছিল মিটিং।

ফিরবো না জেনেও বের হচ্ছি নিসঙ্গ প্রতিদিন।

ছবি
তৈমুর খান

ছবি তুলে নাও
বসন্তের কোলবালিশে স্বপ্ন শুয়ে আছে
বিছানার চাদরে বাগান, রঙিন ফুলেরা ফুটেছে

ছবি তুলে নাও
দুয়ার খোলাই আছে
মৃদুমন্দ বাতাসে পর্দার কানাকানি
এপাশ-ওপাশ করে গোলাপি ঠোঁট
হয়তো-বা জন্ম দেবে নতুন কাহিনি

ছবি তুলে নাও
আলো লটকে আছে দেয়ালে
অনুভূতিগুলি কিছুটা টিকটিকি
হ্যাঙ্গারে ঝুলে আছে বাসনা
ঘুম বুনছে একাকী নির্জনের পাখি!

নিলয় রফিক
জোছনা পাগল

জুলাই মাস ডাকছে, সুরভিত ঘ্রাণ
মনুষ্যত্ব মুখরিত রাজপথে গান
পুরানো শকুনিচোখে ধারালো নখর
লুটের আনন্দে নৃত্য, অনাহারে তীর

ধৈর্যের জোরারে বাঁধ, পূর্ণিমার জল
ক্ষোভের তরঙ্গে ঝড়, জোছনা পাগল
শান্তির মোহনা খুঁজে সাঈদ, মুগ্ধরা
শিলালিপি রক্তফুল অমৃত প্রদীপ

সাহসে সম্মুখে বুক শহিদের সখা
রক্তের শপথে ডানা মুক্তির বিশাখা
আর কত মৃত্যুপুরী শান্ত হবে তুমি
শাড়ি ধরে টান মার গঙ্গায় সমাধি।

পাপের পৃথিবী থেকে এসে
সৌহার্দ সিরাজ

আমি আলো চিনেছি মায়ের কাছে
অন্ধকার চিনেছি মায়ের কাছে
আমার দৃষ্টি আরো প্রগাঢ় এখন
আরো দায়িত্বশীল
তোমরা কেন আমাদের আলো কেড়ে নিতে চাও!
কেন অন্ধকার ফিরিয়ে দিতে চাও!

যদি এই সত্যার্থীরা না থাকত
এই ঘাসের মায়া যদি না থাকত
কুয়াশায় ভিজে যাওয়া সবুজ পানকৌড়ির ডানা না থাকত
আমরা যেতাম কোথায়?
আমরা কোনদিকে তাকাতাম!

তোমরা নিকোটিনে ঘেরা ছিলে
এ্যামোনিয়া তোমাদের ফুসফুসের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল
আলোকে তাই চিনতে পারনি
মিথ্যার সাথে, মিথের সাথে আত্মীয়তা কেন?
বলতে হবে তোমাদের
জনস্রোত মানো না বলে ভেসে যেতে হলো

পুরানো কবরগুলো তাকিয়ে আছে আদালতের দিকে
রক্তের কাপড় পরে সারিবদ্ধভাবে আসছে
মিথ্যা মামলার আসামি
খেলনা হাতে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে গুলি খেয়ে মরা
ছোটো একটা মেয়ে; ওর নাম তিতলি ছিল
শোকাতুরা বাবা মা ভুলে গেছে সে নাম

কারা তোমরা? পাপের পৃথিবী থেকে এসে
আমাদের বিক্রি করে দিলে!
আমাদের সন্ধ্যা, নীলাকাশ, পাখির কালো চোখ
কেড়ে নিলে, রাখতে পারলে? কেউ কি পেরেছে?

সমুদ্রজলের নৃত্যে ভেজাবো মন
পুলিন রায়

বুকের ভেতর ঘূর্ণি, আনন্দের;
শতাব্দীর শরীর ছেনে এনেছি সুখগীতি
নগরে পত্তন হবে বেহুলাবাসর
সমুদ্রজলে নৃত্যে ভেজাবো মন
ও নদী-ও বৃক্ষ সাক্ষী হও

গোলকধাঁধায় পড়ে নাচুক বিশ্ব
আমার পৃথিবীর কক্ষ পথ
ঘোরে কেউ-বৃহন্নলার সাজে
সময়ের পায়ে পুঁটলিবাধা জীবন;

সম্মুখে দোলে রঙিন ঝালর
চড়ুইয়ের ঝাঁক মাপে
সমুদ্রজলের সীমানা।

দুপুর নৃত্যে মাতাল
ও-পাড়ার জীবনবাবু
বেঘোরে স্বপ্নে মজে
জীবনপুঁটলা ভিজুক সমুদ্রজলে...

আমিনুল ইসলাম সেলিম
দমঘর

দমঘরে হাওয়া আসে হাওয়া যায়
পর্যাবৃত্ত গতি মেনে সময়ের হিসেব মিলিয়ে
আয়ুরেখা দীর্ঘতম রাত্রির অফুরন্ত কায়া
হাওয়া খেলে এক্কাদোক্কা
হাওয়া খেলে ঐশ্বরিক চাল
মধ্যবর্তী জৈবক্ষুধা খুলে বসে হিসেবের খাতা
ভুল গণিতকে কাটা চিরায়ত সমস্ত গরল

হাওয়া আসে হাওয়া যায়
অট্ট হেসে খুলে গেলে মাতাল দরোজা
খোয়াবি জীবন থেকে খসে পড়ে তাবিজের মোম
তখন অন্ধকারে জিকিরের পেরেশানিশেষে
আরাধ্য জীবন ডাকে ছলমোহনায়

হাওয়া এসে থেমে গেলে
সব বাঁশি সুরক্লান্ত মৃত বাঁশনল
দমকলে দমবন্ধ, অন্ধ জ্যোতিরেখা।

জলের যে পুত
সাইয়্যিদ মঞ্জু

যখন দণ্ডিত হয় সমুদ্র নদীর
আমার কবিতা
নিজের ভেতর পীড়াপীড়ি করে ব্যক্তিগত
কিছু শরমভরম
কোনো ঘুমে দেখিনি তো কবি হব এ-ই স্বপ্ন
অন্তরে অদ্ভুত অনুভূতিগুলো জলচর হয়ে
নদী ও সমুদ্র বুকে অহর্নিশি করে বিচরণ

বিধবার দীর্ঘশ্বাস অথবা বিধ্বস্ত উপকূল
বাদবাকি ম্যানগ্রোভে স্বরলিপি নিধনের সুর
চর, দ্বীপ, বিস্তীর্ণ সৈকত জুড়ে সমস্ত কুহক
অকূল পৃষ্ঠায় কখনো উড়ুক্কু কখনো শুশুক
কখনো কাছিম হয়ে জেলিফিশ খাই

তোমাদের যত–
তুচ্ছতাচ্ছিল্যতা আমার মঙ্গলময় সহগামী
জলের যে পুত জানে বহুমুখী স্রোতের গন্তব্য
মাছ বংশ ধরে তিনভাগ বাদবাকি একভাগ...

মিজান মনির
মহেশখালী

সবুজ পাতার প্রেম সংসার মূলধন
শাদা সোনা, বাগদা, ঐতিহ্য বিলীন
কাদামাটি শান্তি ঘর ছাউনির শন
জন্মদাগ সাফ কবলায় অর্থ সীমাহীন!

পুকুর ভরা মাছ, জমি ভরা নানান চাষ
জমিদারি স্বভাব, পালটে দিলো অভাব!
শিয়ালের হাঁক, জোনাকজ্বলা চারপাশ
দেখা নেই দ্যুতি, সুরালো পুথি পাই না জবাব!

বাপ-দাদার ভিটে-ঘর দূর্বাঘাসে হাহাকার!
'মৈনাক ছুঁই নীলমুদ্রায়' বিপরীত আকার
প্রজন্মেও প্রশ্ন এ দ্বীপ কার উত্তরাধিকার?
স্বপ্ন যাযাবর, চায়ের কাপে মলিন মুখকার!

নূপুরের জন্য সনেট
মীর লিয়াকত

পাহাড়ের ঝরনা দিয়ে যায় জলধারা
অবিরাম পথচলা নেই কোনো ক্লান্তি
মানুষের পরিবেশে নেই কোনো শান্তি
শিখনের দরজাটা খুলে দেবে কারা।

ক্ষয়ে যাবে স্বপ্নের নূপুরের শৃংখল
নিঃশেষ হয়ে যায় রূপজ ভালোবাসা
শূন্য নীল আকাশে বাঁধে সুখের বাসা
সোনালি শাড়ির পাড়ে মেশে ফুলদল।

যতই কাছে ডাকি তারে সে যায় দূরে
চোখ তার হরিণের মতো যেন উড়ে।

প্রেমের রঙের কাছে হার মানা সুর
পাখির ডানায় চড়ে দেখে যায় বন
জীবনে কবির কাছে কিবা প্রয়োজন
প্রেমের বহ্নিশিখায় কেটে যায় ভোর।

পাখিসঙ্গ
ছাদিক সিরাজী

পাখিরা নিজেদের মতো করে সঙ্গী বেছে নেয়।

ইগল ইগলের সাথে
কাউয়া কাউয়ার সাথে
চড়ুই চড়ুইয়ের সাথে

কেউ অহেতুক পছন্দ করে না
কেউ তার যোগ্যতার বাইরে যায় না।

যারা যায় তারা একসময় বিরান হয়ে যায়।

রক্তাক্ত মুখ
সৌরভ দুর্জয়

ভুলে যেতে চাই বটে, তবু অন্ধ চোখে ভেসে উঠে
বায়ান্ন ঊনসত্তর; একাত্তর নব্বই'র ছবি।
ছাত্র জনতার রোষে, চুরমার হয়েছে সিংহাসন,
বনবাসে গেছে চলে বন্য শাসক শাবকসহ।
আসাদ মতিউরের; দেখানো পথে শহিদ হলো
মিলন নূর হোসেন, সেই ছবি হয়নি মলিন
আবার চব্বিশে এসে শহিদ হলো আবু সাঈদ
সাথে আরো বহুজন, আমারই মায়ের সন্তান।
যাদের রক্তাক্ত মুখ, বিস্মৃতি হবে না কোনোদিন।

ভূমিকম্পের দুর্যোগ

(শেষ পাতার পর)

পেরেছে। সেখানে ভূমিকম্প হবে। বিল্ডিংয়ে ঝাঁকুনি হয়ে দোলবে কিন্তু বিল্ডিং ধসে পড়বে না। প্রযুক্তি তারা ভূমিকম্প সহনীয় করতে পেরেছে।

কিন্তু আমাদের দেশের ইমারত নির্মাণে নেই কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা। যে যেভাবে পারছে অনিয়মই যেন নিয়মের নিয়তি করে নিয়েছে। রানা প্লাজা কোনো ধরনের ভূমিকম্প ছাড়াই ধসে হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। পুরো ঢাকার চিত্র বলে দেয় কি পরিমাণ ভবন রয়েছে এ শহরে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি ভায়াবহ কোনো ধরনের ভূমিকম্পের দুর্যোগ নেমে আসে, তাহলে তার সামান্য উদ্ধার তৎপরতা চালানো সম্ভব হবে না। তার কারণ- আমাদের আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম নেই। প্রশিক্ষিত লোকবল নেই। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো দশা হবে তখন ফায়ার ফাইটারদের অবস্থা। বিল্ডিং করার সময় ভূমিকম্প প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বারবার বলা হলেও কে শোনে কার কথা। একটি বহুতল ভবন করার জন্য তার সামনে যতটুকু সড়ক রাখার কথা, তার কোনো ধরনের নিয়মই মানা হয় না। বিল্ডিং ধসে পড়লে উদ্ধারকারী সেখানে পৌঁছার মতো কোনো ধরনের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। উত্তরাঞ্চলের বন্যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে সেখানে উদ্ধার সরঞ্জামের কি পরিমাণ অভাব ছিল। ঢাকা থেকে স্পিডবোট নিয়ে সেখানে উদ্ধার তৎপরতা চালাতে হয়েছে। এটা ভাবা যায়? ভূমিকম্পে ক্ষতিসাধন ঘটলে সে পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি না হয়, তার পূর্ব প্রস্তুতি এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা শহরে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তার ৭০ ভাগই ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। তাই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার উদ্ধার কাজের জন্য দক্ষ জনবল এবং আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম এখনই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। নইলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন হয়ে পড়বে।

জার্মানির সামরিকীকরণ

(শেষ পাতার পর)

ম্যাগাজিনটি পরামর্শ দিয়েছে, যদি 'নতুন জার্মানিতে' উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় আসেন, তাহলে তারা দেশের সীমানা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে পারেন, অথবা 'সামরিক ব্ল্যাকমেইল' করতে পারেন।

২২ মার্চ জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ার একটি সাংবিধানিক সংশোধনীতে সই করেছেন। এর ফলে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং ৫০০ বিলিয়ন ইউরোর একটি বিশেষ অবকাঠামো তহবিলের জন্য তথাকথিত ঋণ-বিরতি শিথিল হবে। বিশেষজ্ঞরা এই আর্থিক প্যাকেজটিকে ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। কারণ, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এক থেকে দেড় ট্রিলিয়ন ইউরো হতে পারে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মতে, জার্মানি সামরিকীকরণের পথ তৈরি করেছে এবং চার বছরের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবিত ৮০০ বিলিয়ন ইউরো পুনর্সজ্জিতকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ আদায়ের পরিকল্পনা করছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জার্মানিতে নাৎসি মতাদর্শের প্রকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪ মার্চ ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন বলেন, তিনি ইইউ নেতাদের কাছে ৮০০ বিলিয়ন ইউরোর বাজেটের মাধ্যমে এই সংস্থাকে পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছেন। এতে শর্ত দেওয়া হয়েছে, ইউরোপীয় কমিশন ইইউ'র সামরিক শিল্পে ১৫০ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগের জন্য প্যান-ইউরোপীয় ঋণ গ্রহণ করবে। এই কৌশলে ইইউ দেশগুলোর সামরিক চাহিদার জন্য বিনিয়োগকে উদ্দীপিত করার (২০৩০ সালের মধ্যে ৬৫০ বিলিয়ন ইউরো) পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ট্রাম্পের অভিবাসন

(শেষ পাতার পর)

অভিবাসন সংক্রান্ত অনেক পুরানো একটি নীতির অবসান ঘটাতে যাচ্ছেন। এই নীতির কারণে আগে কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষ স্কুল ও চার্চে অভিবাসন চালাতে পারত না। যুক্তরাষ্ট্রে কেউ জন্মগ্রহণ করলে জন্মসূত্রে দেশটির নাগরিকত্ব পেতেন। প্রায় দেড়শ' বছরের পুরানো এই সাংবিধানিক অধিকারকে ট্রাম্প হাস্যকর বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি এই বিধান বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে শুধু নির্বাহী আদেশ দিয়ে এই নীতি পরিবর্তন করা কঠিন। ট্রাম্পের এই আদেশ মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনের বিরুদ্ধে যায়। ১৮৯৮ সালের ওই সংশোধনীতে বলা হয়, মার্কিন ভূখণ্ডে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকেই দেশটির নাগরিকত্ব পাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, দেশটিতে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে সে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাবে। এক্ষেত্রে ওই শিশুর বাবা-মা কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে প্রচলিত নিয়মে ট্রাম্প প্রশাসন পরিবর্তন আনতে চান। নথিবিহীন অর্থাৎ অবৈধ কোনো অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান প্রসব করলে সেই শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্কিন নাগরিকত্ব পাবে না। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলে ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তের পর অভিবাসী নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্ত আমেরিকার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখবে না বলে কোনো কোনো সংগঠন জানিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসীদের জীবন ধ্বংসের জন্য সক্রিয় তৎপরতা শুরু করেছে। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পরই ফেডারেল সরকারের সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো অবৈধ অভিবাসী অথবা সাময়িক ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, এমন কেউ সন্তান জন্ম দিলে সেই শিশুকে যেন মার্কিন নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি যেন দেওয়া না হয়। এ নির্বাহী আদেশে সই করার পরপরই আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন নামের একটি সংগঠন জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এমন আদেশের বিরুদ্ধে তারা মামলা করবে। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া শিশুকে নাগরিকত্ব না দেওয়ার আদেশ শুধু আংবিধানিক নয়, একইসঙ্গে তা আমেরিকার মূল্যবোধের বেপরোয়া ও নির্মম প্রত্যাখ্যান। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের এ সাংবিধানিক অধিকার যদি ট্রাম্প কেড়ে নিতে চান, তাহলে তাকে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ও উচ্চকক্ষ সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পেতে হবে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের প্রভাব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'পলিটিকো'-এর একটি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই আদেশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া সেই সকল শিশুকে নাগরিকত্ব না দেওয়া; যাদের মা অবৈধভাবে বা পর্যটনসহ বিভিন্ন ভিসায় দেশটিতে অবস্থান করছেন, শিশুটির বাবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন বা আইনসঙ্গতভাবে স্থায়ী বাসিন্দা নন। এখন থেকে ৩০ দিন পর যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে কারও মা-বাবা দুজনের কোনো একজন যদি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হন বা গ্রিন কার্ডধারী না হন, তাহলে সেই শিশুকে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ও ভিসা দেওয়া হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্ট্রারের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত এক নোটিসে বলা হয়েছে, এ পরিবর্তনের প্রভাব জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। একইসঙ্গে অভিবাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে সরকারি খরচ কমবে। নতুন করে গৃহীত আরেকটি নির্দেশনায়, 'মানবিকতার খাতিরে ছাড়' প্রদানের সুবিধাও বাতিল করা হয়েছে। সুবিধাটির আওতায় সুনির্দিষ্ট কিছু অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করা হতো। এখন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অভিবাসীদের বিতাড়ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান 'দ্রুত অপসারণ' নীতির আওতা বৃদ্ধির জন্য ট্রাম্পের গৃহীত পদক্ষেপকে আটকে দেওয়ার জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত একটি সংগঠন মামলা করেছে। 'মেক দ্য রোড নিউইয়র্ক' নামক অভিবাসীদের পরামর্শক সংগঠন ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার আদালতে মামলাটি করেছে। তাদের মতে, দ্রুত অপসারণ নীতির আওতায় পড়া অভিবাসীদের কোনো আইনজীবীর সহায়তা নেওয়ার সুযোগ নেই এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের অপসারিত হওয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন না। মামলায় বলা হয়েছে, 'এক্সপিডাইটেড রিমুভাল' নামে পরিচিত এ নীতি যথাযথ প্রক্রিয়া, অভিবাসন আইন ও প্রশাসনিক আইন অনুসরণ না করায় তা সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে। অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাদের আইন সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও আওতা বাড়ানো 'দ্রুত অপসারণ' নীতিতে তা নেই। এ নীতিতে আইন সুরক্ষা পেতে অনেক বছরও লাগতে পারে। কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, সম্প্রসারিত দ্রুত অপসারণ নীতি অভিবাসীদের বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া ও সংবিধান অনুসরণ করা এড়াতে ট্রাম্পকে প্রতারণামূলক একটি সুযোগ এনে দিতে পারে। ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালে অভিবাসীদের বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, 'দ্রুত অপসারণ' নীতির সম্প্রসারণ তারই প্রতিফলন হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে অভিযান শুরু হয়েছে। অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করাকেই ট্রাম্প প্রশাসন অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহরে পরিচালিত অভিযানে প্রথম ৯ দিনে ৭ হাজার ২০০-এর বেশি অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে সর্বোচ্চ ১০ হাজার সেনা মোতায়েনের জন্য তৈরি থাকতে সামরিক বাহিনীকে ট্রাম্প প্রশাসন নির্দেশনা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সার ব্যুরোর ২০২৪ সালের প্রকাশিত তথ্যানুসারে, ২০১০ এবং ২০২২ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা অভিবাসীদের সংখ্যা ২৯ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪৬ লাখে পৌঁছেছে। সীমান্ত এজেন্ট মাইকেল ব্যাঙ্কস কর্তৃক ফক্স নিউজের একটি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, ট্রাম্পের অভিষেকের পরদিন ২১ জানুয়ারি থেকে অবরুদ্ধ দক্ষিণ সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে ৯০ শতাংশ কমে গেছে। সীমান্ত টহল কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হওয়া অপরাধী অভিবাসীদের বিচারের হার ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, মার্কিন সীমান্ত টহল বাহিনী কীভাবে কাজ সম্পন্ন করতে হয়, কীভাবে সীমান্ত সুরক্ষিত করতে হয় তা জানে। আমাদের শুধু একজন প্রেসিডেন্টের প্রয়োজন ছিল, যিনি আমাদের ক্ষমতাবান করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ পথে প্রবেশের চেষ্টাকারী অভিবাসীদের সংখ্যায় এই বিপুল পরিমাণ হ্রাস পাওয়া– ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর সীমান্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির সরাসরি ফল বলে বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেন। সবচেয়ে সহিংস অপরাধীদের গুয়ান্তানামো বে-তে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, ৩০ হাজার অভিবাসী রাখার জন্য গুয়ান্তানামো বে তৈরি করা হচ্ছে। ট্রাম্পের গৃহীত এই কঠোর অভিবাসননীতির কারণে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা হলেও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন, এর কিছু সুফলও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ১ কোটিরও বেশি অবৈধ অভিবাসীকে বিতাড়িত করা হলে দেশটিতে অপরাধ কমবে। একইসঙ্গে মার্কিনসহ সকল বৈধ অভিবাসীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে বলে ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা হিস্পানিক অভিবাসন ঠেকানো। যুক্তরাষ্ট্রে হিস্পানিক অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে চাচ্ছেন। তিনি অবশ্য বৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে চান না। গত ২০ জানুয়ারি থেকে মার্কিন সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশকারীদের আটক করা শুরু করেছে। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামরিক হেলিকপ্টারে করে তাদের পাঠানো হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে আতঙ্ক ছড়ালেও বৈধ অভিবাসীরা লাভবান হবেন। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটিতে থাকা বহু অবৈধ অভিবাসী অপরাধ করে বেড়াচ্ছেন। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মার্কিনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বৈধ অভিবাসীরা। এ অভিযান সফল হলে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে এবং বৈধ অভিবাসীরা নিরাপদে থাকবেন। ট্রাম্পের গৃহীতি নীতিগুলো মূলত মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা এবং কানাডা থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্য করে হলেও সমগ্র বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব পড়বে। ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত অভিবাসন নীতির ফলে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশে রেমিটেন্স আসা দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম। এতে করে দেশে রেমিটেন্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও অধিকতর যাচাই-বাছাই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সে দেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়েছেন। অন্যরা অভিবাসী। ট্রাম্প এই ৩৪ শতাংশকে অবৈধ ঘোষণা করে ভারতে ফেরতে পাঠালে সে দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তথ্যানুযায়ী, অবৈধ বসবাসকারী ভারতীয়দের সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজারের মতো। তাদের মধ্যে ২০ হাজার ৪০৭ জন ভারতীয়ের নিকট কোনো নথি নেই। ট্রাম্পের এই পরিকল্পনার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিশিল্পে সংকট দেখা দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০ শতাংশ খামার শ্রমিকদের বৈধ অভিবাসন মর্যাদা নেই। এসব শ্রমিক যদি কাজ করতে না পারেন বা আটক হন, তাহলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলেও বিশ্লেষকরা মনে করেন।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বালাগঞ্জ

(শেষ পাতার পর)

উক্তরূপ সংগঠন গড়ে তুলতে উৎসাহ যুগিয়েছে।

ধর্ম, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৃহত্তর বালাগঞ্জের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। স্বনামধন্য বালাগঞ্জের ক'জন শিক্ষাবিদ হলেন গোলাম মোস্তফা (আমেরিকার একটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনারত। তাঁর স্ত্রী মিসেস নাজমা মোস্তাফা একজন বিশিষ্ট লেখিকা), হুসন আরা আহমদ, মোঃ আব্দুল আজিজ, ড. সানী ওসমানী (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত) ও মহিউদ্দিন শীরু প্রমুখ।

বালাগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রভৃতি তুলে ধরে প্রকাশিত বই/সংকলনের প্রকাশনা অনেক। অন্যান্য বিষয়ের সাথে বালাগঞ্জবাসীর সুখ-দুঃখ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে বর্তমানে বালাগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ক'টি প্রকাশনা (নিয়মিত/অনিয়মিত) হচ্ছে- সাপ্তাহিক বালাগঞ্জ বার্তা (সম্পাদক ও প্রকাশক শাহাব উদ্দিন শাহীন), আয়না (সম্পাদক ও প্রকাশক জিল্লুর রহমান জিলু, আনোয়ারা (সম্পাদক ও প্রকাশক আব্দুর রশীদ লুলু), বালাগঞ্জ ভিউজ (সম্পাদক ও প্রকাশক মুহাম্মদ আব্দুল জলিল), বালাগঞ্জ প্রতিদিন (প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক- মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান) ও চাষাবাদ (সম্পাদক ও প্রকাশক আনিসুল আলম নাহিদ) প্রভৃতি।

তথ্য প্রযুক্তিতেও বালাগঞ্জ সংযুক্ত রয়েছে। দেশে-বিদেশে অনেক বালাগঞ্জবাসী তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করছেন। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও উদ্যমী অনেক বালাগঞ্জবাসী দেশ-বিদেশে তথ্য আদান-প্রদান করছেন স্বাচ্ছন্দে। নতুন প্রজন্ম সংযুক্ত হচ্ছেন তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়কে। বালাগঞ্জের একজন খ্যাতিমান হোমিও চিকিৎসক প্রেমদা রঞ্জন দাশ ছিলেন দেশ-বিদেশে খ্যাতিমান। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সরাসরি কাজ করা বালাগঞ্জের একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান মরহুম আব্দুল মালিক কৃষি কল্যাণ কেন্দ্র (স্থাপিত: ২৫ অক্টোবর ২০২৪)। এ কেন্দ্রের প্রতিপাদ্য 'কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে কাজ করি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও পৃথিবী গড়ি'।

বালাগঞ্জের অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, ভারত বিরোধী রেফারেন্ডামে, পাকিস্তান বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বালাগঞ্জবাসীর বলিষ্ঠ ভূমিকার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও রয়েছে প্রচুর সফলতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন- প্রযুক্তি, কৃষি, শিল্প প্রভৃতিতে) রয়েছে বালাগঞ্জের প্রচুর সম্ভাবনা। বলাবাহুল্য, নিবন্ধের পরিসর বৃদ্ধির আশংকায় বালাগঞ্জের অফুরন্ত সম্ভাবনার দিকগুলোতে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হলো না।

প্রিয় বালাগঞ্জকে নিয়ে এ নিবন্ধ লিখতে গিয়ে বার বার মনে হচ্ছে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সচেতন সকল বালাগঞ্জবাসীকে বলি- ছোটখাট বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সমৃদ্ধ-সম্ভাবনাময় বালাগঞ্জ আমাদের ডেকে যাচ্ছে। আসুন আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের পদাংক অনুসরণ করে যে যায় অবস্থান থেকে (ব্যক্তিগত/ সম্মিলিতভাসে) বালাগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করি। অন্যদের কাছে আমরা দৃষ্টান্ত হই।

লেখক : আব্দুর রশীদ লুলু: ইসলাম ধর্ম, হোমিওপ্যাথি ও কৃষি বিষয়ক লেখক ও গবেষক। আনোয়ারা হোমিও হল, দেওয়ান বাজার, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট। মোবাঃ ০১৭১৮ ৫০৮৯৮০, lulucenter2013@gmail.com

ঋতুর শেষে

(৫ এর পাতার পর)

সাকিবের পাশেই ধপাস করে বসে পড়ে বলল–'সাকিব তোমাকে আমি দারুণ ভালোবাসি!'

বলেও সে একটুও অবাক হলো না! সে সাকিবের চোখের দিকে চেয়েই মৃন্ময়কেও ভুলে গেল।

জবাবে সাকিব বলল–'সেই কলেজ লাইফ থেকেই আমিও। তোমার পিছন পিছন পাগলের মতো ছুটেছি!'

মৃন্ময়ের বিবাহিত স্ত্রী তারই সামনে সাকিবের হাতদুটো ধরে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপলক!

মৃন্ময়েরও পলকহীন দৃষ্টি!

ঠিক সেই সময় পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন নিভে গেল! গভীর অন্ধকারের ভিতর থেকে নৃশংস জন্তুর চিৎকার ভেসে এলো! সি আই ডির খুনি কুকুরদের চোখ জ্বলে উঠল যেন কত্তগুলো। আর গভীর অন্ধকার চিরে টর্চের আলো সেই খুনি কুকুরগুলোকে পথ দেখিয়ে মনামি-সাকিবের দিকেই ধেয়ে আসতে লাগল!

শুকনো জায়গা পেলে

(৫ এর পাতার পর)

লাগছে, সাজিদের পানির তেষ্টা পাচ্ছে, সাজিদের মৌলির মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছে, সাজিদের আবারও কাজের ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে, মুখে ফুটে বলতে ইচ্ছে করে সেকথাগুলো। কিন্তু পারছে না। চারপাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে ওর একটু একটু করে। পরিচিত একটি কণ্ঠস্বরের চিৎকার কানে ভেসে আসছে। ওটা কী মৌলির চিৎকার! মৌলি কেন এখানে? ওর কী হয়েছে? ওর কি লেবার পেইন উঠেছে? একটি ঠান্ডা হাত সাজিদের কপালে হাত রাখে। সাজিদ চোখ খুলতে চায়। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে চোখ খুলতে চায়। সন্তানের পবিত্র মুখটা তো দেখা হলো না। সাজিদের চোখের উপরে তীব্র আলোর ঝলক। ঝলসে যাচ্ছে চারপাশটা। তারপরও সাজিদ একটিবারের জন্য চোখদুটো মেলতে চায় সন্তানের মুখটা একটিবার দেখার জন্য। পারে না। পরদিনের সংবাদপত্রের হেডলাইনটা কী হবে? ও কি সেই হেডলাইন হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে...

সাজিদের হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৌলি। ওর সামনে কঠিন একটা সত্য দাঁড়িয়ে আছে। মুখোমুখি। কী করবে মৌলি ভেবে পায় না। অনুভূতিগুলো কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। কিছুই আর ওকে স্পর্শ করছে না। মৌলি অনুভব করে, ওর পা বেয়ে পিচ্ছিল কিছু গড়িয়ে পড়ছে। ওটা কি গর্ভে জমিয়ে রাখা গর্ভরস? মৌলি বোঝে ওর সন্তান পিতার মুখখানি শেষবারের মতো দেখার আশায় বেরিয়ে আসতে চায় মায়ের অমরা ছিঁড়ে। নিজে আজ খুব সৌভাগ্যবান অন্যদিকে দুর্ভাগা মনে হচ্ছে মৌলির। দীর্ঘ পাঁচ বছরের চিকিৎসা ও সাধনা পরে আজ ওর কোল পূর্ণ হবে। ওদিকে স্বামী জীবনমরণের মাঝেমাঝি দাঁড়িয়ে আছে। মৌলি চিৎকার করে ডাক্তারদের ডাকে। ভয়ে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসে। এত মানুষের ভিড়ে ওর কথা কেউ শুনতে পায় না। মৌলির শরীরটা মাটিতে নেমে আসে।

সেই রাত আটটা থেকে ঢাকা মেডিকেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তৈয়ব। এখন রাত একটা। রিকশার প্যাডেলের উপরে এক পা দিয়ে কিছুসময় দাঁড়িয়ে ছিল। এখন বসে আছে রিকশার সিটে। অপেক্ষা। আজ সন্ধ্যায় সম্ভব ত্রিশ বছরের এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে তৈয়ব। হালকা-পাতলা ছেলেটার পেটে গুলি লেগেছে। লোকটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তৈয়বের সামনে। তৈয়ব বুঝতে পারে না কী করবে! তুলে দেখে ডান পেটের পাশ থেকে হড়বড় করে রক্তের স্রোত বের হয়ে আসছে। লোকটাকে টেনে তুলতে আরো দুইজন ওকে সাহায্য করে। তারপরে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। সাহায্যকারী একজন হাসপাতালে নিয়ে গেছে। অন্যজন জরুরি কাজের তাড়ায় চলে গেছে। এড়িয়ে যাওয়া। তৈয়ব যেতে পারে না। মায়া হয় লোকটার জন্য। তাই তো সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার কী হলো, জানার আগ্রহে। দুই হাসপাতাল ঘুরতে ঘুরতে লোকটা প্রায় আধমরা। কোনোমতে এখানে নিয়ে এসেছে। সারা পথ ঘুরতে ঘুরতে ওর সারা গায়ে রক্তের স্লোগানগুলো অদ্ভুত একটি মানচিত্র এঁকেছে। যে মানচিত্র তৈয়ব চেনে না। ওর মাথায় আসে না। হঠাৎ এই নিঝুমপুরীর মানুষগুলো এতটা প্রতিবাদী হয়ে উঠল কেন? দুইদিন আগেও তো সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। সকালে বেরিয়েছিল অন্য আর দশটা দিনের মতো। বের হবার সময় রাহেলা বলেছিল,

আইজকা সাবধানে থাইকেন কইলাম।

তৈয়ব চেয়েছিল সাবধানে থাকার জন্য। কিন্তু চারপাশে মানুষের এত রক্ত দেখে ওর মাথা এখন আর ঠিক নাই। ছোটো ছোটো পোলাপাইনগুলান। মায়া লাগে তৈয়বের। ঘরে ওর বউ ও ছেলে। ছেলেটা সদ্য সাবালক হয়েছে। কথায় কথায় তর্ক জুড়ে দেয়, আর প্রতিবাদ করে। ছেলেটা কি আজ ওর ঘরে আছে? এত ছেলেপেলের মাঝে ওর আশিক নেই তো? তৈয়বের মুখ, ঠোঁট শুকিয়ে আসে। তৈয়বের ভয় লাগে। সারাদিন এত ধকলে ঘরের মানুষগুলোর খবর নেয়া হয়নি। তৈয়ব রিকাশার প্যাডেলে পা রাখে ঘরে ফেরার জন্য।

রাহেলা গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্বামী ও ছেলের অপেক্ষায়। ছেলেটা দুপুরের একবার এসেছিল। তারপরে আর কোনো খবর নাই। স্বামী তো সেই কাকডাকা ভোরে রিকশা নিয়ে বের হয়েছে। বস্তিতে কান্নার রোল। কয়েকঘর পরে একজন ফিরে এসেছে গায়ে অসংখ্য ছিটাগুলি নিয়ে। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে লোকটা এখন হুঁশ হারিয়ে ফেলেছে। পাশে তার প্রিয়জনরা চিৎকার করছে। রাহেলা গিয়েছিল। কষ্টে লোকটার মুখটা নীল হয়ে গেছে। একটু দূরে মহাসড়ক। টায়ার পোড়া গন্ধ নাকি মানুষ পোড়া গন্ধ বোঝা যায় না। তবে গন্ধটা নাকের ভেতরে ঢুকে বুকের ভেতরে কাঁপন ধরায়। মনে মনে রাহেলা আয়াতুল কুরসী বিড়বিড়িয়ে পড়ে। ওর চোখ দুটো ছলছল...

রাতগুলো দীর্ঘ হয়। বিশেষ করে শোকের রাতগুলো। সেঁজুতির প্রতিটি রাত দীর্ঘ। কবে কাটবে ওর এই শোক। প্রতিবেলায় ফিরে আসে শূন্য হাতে। ফিরে আসা কখনো আনন্দের আবার কখনো বিমর্ষতার। অতীতের তলহীন দৃশ্যকাব্যের অনুভূতিগুলো সতেজ হয়ে বুকের ভেতরটাকে বায়ুশূন্য করে দেয়। বায়ুশূন্য বুকটা ভারী, বেশ ভারী। পৃথিবীর ওজনের শতগুণ বেশি। সেঁজুতি আর বয়ে নিতে পারে না। বারবার দাঁড়িয়ে পড়ে। সেঁজুতির পাশের মানুষটির চোখে ক্লান্তি, মনে হতাশা, কপালে বিরক্তির ছাপা। ভেতরে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। হয়তো তা মানসিক চাঞ্চল্য ফুরিয়ে গেছে। সেঁজুতি ইচ্ছে করে মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কিছুটা সময় কাঁদতে। প্রিয় সন্তান সংজ্ঞাহীন, হাসপাতালে প্রতিক্ষণে বীভৎস চিৎকার। স্বজনহারা মানুষগুলোর হাহাকার।

আজ তৈয়ব এসেছে ঢাকা মেডিকেলে। প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেল, ছেলেটা ঘরে ফেরে নাই। শহরের প্রতিটি কোণে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত তৈয়ব। কোনো তালিকায় ছেলের নামটি খুঁজে পায় না। কোথায় হারিয়ে গেল। কথায় কথায় অভিমান করা ছেলেটা কি সত্যি সত্যি সাইকেলের জন্য অভিমান করে ঘর ছেড়ে দিলো। তৈয়ব গুমরে কাঁদে, চিৎকার করে কাঁদে। তারপর ওর আশিক ফিরে আসে না। সেদিন তৈয়ব খবর পেয়েছে, এই আন্দোলন হারিয়ে যাওয়া মৃত ভেবে নেয়া কয়জন ফিরে এসেছে স্বজনের কাছে। সেকারণে তৈয়বের বুকে আশা জন্মায়। হয়তো ছেলে লুকিয়ে আছে। একদিন ঠিক ফিরে আসবে... সেঁজুতি এখন বারবার টোটেনের মোবাইল ফোন করে। পাশের ঘরে রাখা ফোনের রিং হয়, এঘরে বসে সেঁজুতি শোনে সেই রিংটোন। পাগলপ্রায় সেঁজুতি আশা করে টোটোন একটু পরে ফোনটা তুলে বকাঝকা করবে ওকে, আর বলবে,

মা তুমি এত অস্থির কেন, একবার ফোন করে অপেক্ষা করতে পার না! বারবার কল কর। ছোটো বাচ্চা মেয়েদের মতো তুমি।

রাজা আসে রাজা যায়, ক্ষমতার পালাবদলে শুধু কিছু কোল শূন্য হয়ে যায়। আর সুবিধাভোগীরা রূপ পালটে নতুন লেবাসে তৎপরতা শুরু করে। নতুন স্বপ্ন দেখা মানুষগুলো ধীরে ধীরে স্বপ্নভঙ্গের প্রভাতিসংগীত গাওয়া শুরু করে আবারও। পাড়া-মহল্লায়, চায়ের দোকানে, হিসাব কষে, কী হারালো আর কী পেল।

সেঁজুতি, রাহেলা, মৌলি, তৈয়বেরাসহ কিছু মানুষের শোকের রাতগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। সময় ফুরিয়ে আসে, শোকগুলো জলন্ত কয়লার মতো জ্বলজ্বল করে অপেক্ষমাণ মানুষগুলোর বুকের পাঁজরে।

এপ্রিল ২০২৫ইং : বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ : শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরী

বালাগঞ্জ প্রতিদিন
balaganjprotidin.com

বা লা গ ঞ্জ

: আব্দুর রশীদ লুলু

সিলেট জেলার ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ একটি উপজেলা বালাগঞ্জ। বালাগঞ্জ যেমন দেশ-বিদেশ খ্যাত অনেক কৃতি সন্তান জন্ম নিয়েছেন, তেমনি রয়েছে এর অনেক গৌরব গাঁথা ইতিহাস-ঐতিহ্য। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের মতো জরুরি ক্ষেত্রে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ উপজেলার সম্ভাবনা প্রচুর।

আমাদের জাতীয় জীবনে ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই মুক্তিযুদ্ধে বালাগঞ্জের রয়েছে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা ও আত্মদান। সর্বোপরি বৃহত্তর বালাগঞ্জের কৃতিসন্তান মেজর জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।

বালাগঞ্জের ঐতিহ্যের এক ধারক- শীতলপাটি। শীতলপাটি বালাগঞ্জকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি দান করেছে। এই প্রযুক্তির যুগে 'কুটি কামলা'র তৈরী শীতলপাটির চাহিদা আগের মতো না থাকলেও এর খ্যাতি-পরিচিতি এখনো বিশ্বজুড়ে রয়েছে। লেখক-শিক্ষক আব্দুল মঈদ চৌধুরীর বর্ণনা থেকে জানা যায় 'বালাগঞ্জের তেঘরীয়া গ্রামের একজন শিল্পীর তৈরী একটি ফরমায়েশী শীতলপাটি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ দরবারে স্থান পেয়েছিল। এটি ওই সময় চার'শ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে।

চাহিদা ও ব্যবহারের গুণে বাংলা সাহিত্যেও শীতলপাটি স্থান পেয়েছে। অনেক কবি-সাহিত্যিকের লেখায় শীতল পাটির বর্ণনা রয়েছে। শীতল পাটির ব্যবহার ও গুণকীর্তন করে চমৎকার কবিতা লিখেছেন লোকসাহিত্যের গবেষক ও কবি-গীতিকার মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-

"আর মাছ বানাইতে কন্যা লয় ছালি মাটি
ইলিশ বানাইতে কন্যা বিছায় শীতল পাটি।"

বালাগঞ্জের অনেক মানুষ ইংল্যান্ড-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে দেশের উন্নয়নে বলিষ্ট ভূমিকা রাখছেন। বৃহত্তর বালাগঞ্জের অন্যতম কৃতি সন্তান, দেশ-বিদেশ খ্যাত শ্রমিক নেতা আফতাব আলী (১৯০৫-১৯৭১) আমাদের প্রবাসীদের পথিকৃত। তাঁর সূচিত পথ ধরে দেশের বিশেষত সিলেটের অনেকেই আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সপরিবার প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিক নেতা আফতাব আলী আজীবন শ্রমিক ও প্রবাসীদের প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেছেন নিরলসভাবে।

সুদূর প্রবাসে বসে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি অনেক বৃহত্তর বালাগঞ্জবাসী লেখালেখির মাধ্যমে দেশের জন্য কাজ করছেন। এরমধ্যে প্রবাসী ক'জন লেখক হলেন- গিয়াস উদ্দিন আহমদ, নজরুল ইসলাম বাসন, ময়নুর রহমান বাবুল, মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান, ফজির আহমেদ (আশরাফ), সরওয়ার আলম প্রমুখ।

আশার কথা, প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবন-যাপন করেও অনেক সচেতন বালাগঞ্জবাসী সাংগঠনিকভাবেও

দেশের উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছেন। এরমধ্যে ইংল্যান্ডে বালাগঞ্জবাসীর সফল তিনটি সংগঠন হচ্ছে- ০১. প্রবাসী বালাগঞ্জ আদর্শ উপজেলা সমিতি (স্থাপিত ১৯৮৮); ০২. বালাগঞ্জ যুব সমিতি (স্থাপিত-১৯৯০) ও ০৩. প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাষ্ট (স্থাপিত-১৯৯১)।

বলাবাহুল্য, ইংল্যান্ডে উক্ত সংগঠনগুলোর ঈর্ষণীয় কর্মতৎপরতা তথা সাফল্য সিলেটের অন্যান্য উপজেলার প্রবাসীদের ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৭, কলাম ৩

ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন

জার্মানির সামরিকীকরণ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটাতে পারে

নিউজ ডেস্ক

সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য জার্মানির বৃহত্তর প্রচেষ্টা ইউরোপে জাতীয়তাবাদী মনোভাব বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। সেই সঙ্গে এটি মার্কিন প্রভাবকে দুর্বল করতে পারে এবং মহাদেশটিতে ক্ষমতার ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে। ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন এমনটি বলছে।

ম্যাগাজিনের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর জার্মানি 'এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আর নির্ভরযোগ্যভাবে ইউরোপের নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় থাকবে না'। এই লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়কে সীমাবদ্ধ করে - এমন ঋণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মান সরকার।

ম্যাগাজিনটি বলছে, এটি জার্মানির জন্য সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির দরজা খুলে দেবে এবং বার্লিন মার্কিন সহায়তার ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করতে পারবে।

ফরেন অ্যাফেয়ার্স উল্লেখ ম্যাগাজিন করেছে, জার্মানির সামরিক সম্প্রসারণ ইউরোপের জন্য গুরুতর পরিণতি বয়ে আনতে পারে। এটি বার্লিনকে 'নতুন স্বাধীনতা' দেবে এবং শক্তিশালী জার্মান সেনাবাহিনী ইইউতে ক্ষমতার ভঙ্গুর ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে। প্রতিবেশীদের মধ্যে এবং ভবিষ্যতে জার্মানিই জাতীয়তাবাদের উত্থানের দিকে পরিচালিত করতে পারে। ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৭, কলাম ১

একনজরে বালাগঞ্জ

স্টাফ রিপোর্ট

জেনারেল এম এ জি ওসমানীর স্মৃতি বিজড়িত বালাগঞ্জ উপজেলা কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। বালাগঞ্জ উপজেলাটি ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত সিলেট জেলার অন্যতম একটি উপজেলা। ঐতিহ্যগতভাবে বালাগঞ্জ উপজেলা সদর একটি নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। একসময় ব্যাপকভাবে উৎপাদিত 'শীতলপাটী' এ অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যান্য এলাকায়ও সরবরাহ করা হতো। বর্তমানেও এ উপজেলার কোন কোন এলাকায় কিছু কিছু শীতলপাটী উৎপাদিত হচ্ছে। অত্যন্ত আরামদায়ক ও বৈচিত্রময় শীতলপাটী আজও দেশের সর্বত্র সমভাবে সমাদৃত।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী বঙ্গবীর জেনারেল মোঃ আতাউল গণি ওসমানী'রজন্মভূমি হিসেবে বালাগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বালাগঞ্জের দয়ামীর ইউনিয়নের দয়ামীর বাজারের পাশেই তাঁর পৈত্রিক বাড়ি অবস্থিত। তাঁর পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বঙ্গবীর ওসমানী'র অধিনায়কত্বে সামরিক-বেসামরিক যোদ্ধাদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী পরিচালিত হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি তখনকার ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে কেডেট নিযুক্ত হয়ে পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে কর্নেল হন। পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনায় অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য তিনি কিংবদন্তীতূল্য হয়ে আছেন। ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে তিনি যথাক্রমে এম, এন, এ, এবংএম, পি, নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে কয়েকটি মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি লন্ডনে মারা যান। বালাগঞ্জের সন্তান হিসেবে ওসমানী'র জন্য বালাগঞ্জ তথা সমগ্র সিলেটবাসী গর্ব বোধ করে।

বালাগঞ্জ উপজেলার 'শীতলপাটী' উৎপাদন ও বাজারজাত করণের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। দেশে ও দেশের বাইরে এ শীতলপাটী সমভাবে সমাদৃত। বালাগঞ্জ উপজেলার গৌরীপুরের শিল্পীদের তৈরী একটি শীতলপাটী ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়া'র প্রাসাদে স্থান পেয়েছিল। ১৯০৬ সালে কলকাতায় আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে শীতলপাটীর জন্য জদুরাম দাস স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৮২ সালে শীতলপাটী তৈরীর জন্য জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কুটীর শিল্পী হিসেবে পুরষ্কার জিতে নেন বাবু পবনজয় দাস। ইতালি'র রোমে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত কুটীরশিল্প প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের মনীন্দ্র নাথের উপস্থাপিত শীতলপাটী পুরষ্কার লাভ করে। বিভিন্ন ডিজাইন এবং বুননের বৈচিত্রের জন্য শীতলপাটী সর্বত্র সমাদৃত এবং একসময় এ কে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড়ের সাথে তুলনা করা হত। বুননের ধরণ ও বেতের আকৃতির ভিত্তিতে শীতলপাটী বিভিন্ন স্থানীয় নামে পরিচিত, যেমন- সিকি, আধুলি, টাকা, নয়নতারা, আসমানতারা, জোড়াকে-চিরা ইত্যাদি। বর্তমানে বালাগঞ্জ শীতলপাটী'র ঐতিহ্য হারিয়েছে কারণ এখন আর বালাগঞ্জে শীতলপাটী উৎপাদন হয় না, সামান্য যেটুকু উৎপাদন হয় তা যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয়। বিলুপ্তপ্রায় এ শিল্পটির পূণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে।

ভূমিকম্পের দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা কি প্রস্তুত?

অলিউর রহমান ফিরোজ

মিয়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রভাব আমাদের দেশে এসেও পৌঁছেছে। মিয়ানমারের আশপাশের দেশে ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। ব্যাংককের একটি ভবন ধসে পড়ার ঘটনা ছিল আতঙ্কের। মিয়ানমারের রাজধানী নেপিডোতেও ভবন ধসের দৃশ্য দেখা গেছে। সড়ক এবং ব্রিজ ভেঙে পড়ে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ভয়ংকর দৃশ্য রেখে গেছে দেশটিতে। হতাহত হয়েছে কয়েক হাজার। এমন দৃশ্যের মধ্যে বাংলাদেশে যে ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়ে আমাদের সতর্ক বার্তা দিল, তাতে করে আমরা কি ভূমিকম্প মোকাবিলায় কোনো ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি রেখেছি। ১৮৫০ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশের মধ্যে ভয়াবহ ভূমিকম্পের রেকর্ড রয়েছে। যার মাত্রাস্কেল ছিল ৮.৫ থেকে ৮.৭ পর্যন্ত কোনো কোনোটির। কিন্তু তখন বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র লক্ষ্য করা যায়নি। তার কারণ হলো- তখনকার সময়ে দেশের মধ্যে এত ইমারত ছিল না। শুধু পাহাড়ি এলাকায় নিচ থেকে কাঁদা মাটি উদগীরণ আর সুনামি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে তখকার সুনামীতে বুড়িগঙ্গা নদীর আশপাশের বহু বাড়ি ঘর ভেসে গিয়ে ৫ শতাধিক লোকের প্রাণহানির পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। তাছাড়া তখনকার সময়ের বড় ভূমিকম্পের কারণেই সেন্টমার্টিন আইসল্যান্ড ডুবন্ত দীপটি ৯ ফুট ভেসে ওপরে ওঠে দৃশ্যমান হয়। সে ঘটনায় মিয়ানমারের একটি দ্বীপেরও উত্থান ঘটে। সেটি ২৭ ফুটের মতো ওপরে উঠে আসে। আমরা যদি বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই একটা সময় জাপানের ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা ছিল ব্যাপক। মধ্যপ্রচ্যের দেশগুলোতে হাজার হাজার লোকের প্রাণ যেত ভূমিকম্পে। কিন্তু সে চিত্র অনেক দেশই পাল্টাতে পেরেছে। জাপান তার নির্মাণ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প সহনীয় স্ট্রোকচার আদলে রূপ দিতে

▶ এরপর পৃষ্ঠা-৭, কলাম ১

অপরূপ শ্রীভূমি

খালেদ উদ-দীন

প্রকৃতিকন্যা সিলেটের রয়েছে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। হাওর-নদী-পাহাড়ের সিলেটে আছে অরূপ অরণ্যানীও। দেখতে গেলে চোখ জুড়িয়ে দেবে সবুজ চা-বাগানও। পাশাপাশি আরো এমন জায়গা আছে– যেগুলো হৃদয়হরণকারী। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই প্রাচীন জনপদ বনজ, খনিজ ও মৎস্য সম্পদে ভরপুর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত। সিলেটে বসবাসকারি বিভিন্ন আদিবাসীদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি। সিলেটে আদিবাসীদের মধ্যে মনিপুরী সম্প্রদায়ের মনিপুরী নাচে বিখ্যাত। চা বাগান, জাফলং, রাতারগুল জলাবন, হাকালুকি হাওর, লালাখাল, ভোলাগঞ্জ, বিছনাকান্দি, তামাবিল, পাহাড়, ঝর্ণা সব মিলিয়ে নানা বৈচিত্রের সম্ভার এই সিলেট দেশের অন্যতম পর্যটন নগরী। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও সিলেটের রয়েছে প্রসিদ্ধ ইতিহাস। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, চা বাগান, বিভিন্ন রিসোর্ট, হযরত শাহজালাল (র.) ও শাহপরাণ (র.) এর মাজার সহ সিলেটের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান থাকায় সিলেটকে দেশের অন্যতম সেরা পর্যটন নগরী বলা যেতেই পারে।

জাফলং

বাংলাদেশের সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার অন্তর্গত, একটি পর্যটনস্থল। জাফলং, সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে। ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত, এবং এখানে পাহাড় আর নদীর অপূর্ব সম্মিলন বলে এই এলাকা বাংলাদেশের অন্যতম একটি পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত। পর্যটনের সাথে জাফলং পাথরের জন্যও বিখ্যাত। বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্তবর্তী এলাকায় জাফলং অবস্থিত। এর অপর পাশে ভারতের ডাওকি অঞ্চল। ডাওকি অঞ্চলের পাহাড় থেকে ডাওকি নদী এই জাফলং দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মূলত পিয়াইন নদীর অববাহিকায় জাফলং অবস্থিত। এই এলাকায় যেমন সাধারণ বাঙালিরা বসবাস করেন, তেমনি বাস করেন উপজাতিরাও। বিজিবি ক্যাম্প থেকে পাহাড়ের দৃশ্যজাফলং-এ নদীর মনোরম দৃশ্যআখ্তা ঝরণা, জাফলং। জাফলং-এর বাংলাদেশ সীমান্তে দাঁড়ালে ভারত সীমান্ত-অভ্যন্তরে থাকা উঁচু উঁচু পাহাড়শ্রেণী দেখা যায়। এসব পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরণা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া ভারতের ডাউকি বন্দরের ঝুলন্ত সেতুও আকর্ষণ করে অনেককে। এছাড়া সর্পিলাকারে বয়ে চলা ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৩, কলাম ১

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি এবং বিশ্বব্যাপী প্রভাব

ড. মো. মোরশেদুল আলম

ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর যে সব নির্বাহী আদেশে সই করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো– যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি। আরেকটি হলো– জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব আইনসংক্রান্ত। ট্রাম্প এগুলো সই করার পরে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আশ্রয় ও শরণার্থী প্রোগ্রাম স্থগিতকরণ, সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং মাদক চোরাকারবারি চক্রকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পথে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে বিপদগ্রস্ত ও নিপীড়নের শিকার শরণার্থীদের সমর্থন-সহায়ক কর্মসূচি সীমিত করা হয়েছে। যেমন- 'মেক্সিকোয় থাকুন' কর্মসূচি। এর আওতায় মেক্সিকো ছাড়া অন্য দেশগুলোর আশ্রয়প্রার্থীদের মামলা মার্কিন আদালতে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের মেক্সিকোয় থাকতে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে সংযুক্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহত্তর পরিসরে অভিবাসী বিতাড়ন কর্মসূচি চালু করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ক্ষমতায় বসার দিনই তিনি অবৈধ অভিবাসীদের ওপর খড়্গহস্ত হন। জাতীয় সীমান্ত জরুরি অবস্থা ও দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষায় সহায়তার জন্য সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ প্রদানের কথাও তিনি বলেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ তিনি বন্ধ করে দেবেন। অবৈধ অভিবাসীদের অপরাধী হিসেবে বর্ণনা করে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এমন লাখো অভিবাসীকে ফেরত পাঠানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত কর্তৃপক্ষ এই আদেশের আওতায় অভিবাসীদের বৈধতা দেওয়ার একটি প্রকল্পও বন্ধ করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ▶ এরপর পৃষ্ঠা-৭, কলাম ১

প্রধান সম্পাদক
মুহাম্মদ শরীফুজ্জামান

সম্পাদক
শাহেদ মুণ্সী

ইমেইল
info@balaganjprotidin.com

বাংলাদেশ অফিস : কাকলী শপিং সেন্টার, জিন্দাবাজার, সিলেট। যোগাযোগ : ০১৭১১-৪৪৪৯২৮